মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২

মাদক সেবন রোধ করি,
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি।

Care in Crises

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উত্তম সেবাই আমাদের অঙ্গীকার

বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্স তার নিজস্ব জায়গায় মনোরম পরিবেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আন্তরিক ও গুরুত্বসহ সেবা দিয়ে থাকে।

আমাদের মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের সেবা সমূহ:

- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট ও কাউন্সেলরদের নিয়মিত উপস্থিতি (অধিকাংশ কাউন্সেলর ইকো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)।
- নারকোটিকস্ এনোনিমাস (এন.এ) এর চিকিৎসা নীতিমালা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়।
- পীয়ার এডুকেশনের মাধ্যমে অকুপেশনাল থেরাপি, এছাড়া রিল্যাক্সেশন ও রিক্রিয়েশনাল থেরাপি দেয়া হয়।
- রুটিন মাফিক ক্লাসের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের বিষয়ে শিক্ষা দেয়া এবং অনুপ্রেরণা, আশা ও শক্তি সঞ্চয় সম্পর্কে মত বিনিময় করা হয়।
- বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর পন্থা শেখানো হয়।
- স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ও নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।
- যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

"Addressing drug challenges in health and humanitarian crises."

বিওয়াইএফসি ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র
বি ৮/৯ পূর্ব ভবানীপুর, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ০২২২৪৪৪৬৪৫৩, ০২২২৪৪৪২০৩৬
হটলাইন: ০১৭০৩-৭৮৮৯৪৯, ০১৩২৯-১৭৫০৩৩
E-mail: byfc.mnk@gmail.com, byfcinfo@yahoo.com,
web: www.yfcbd.com

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদকের অপব্যবহার নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমে একাধিকবার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান)

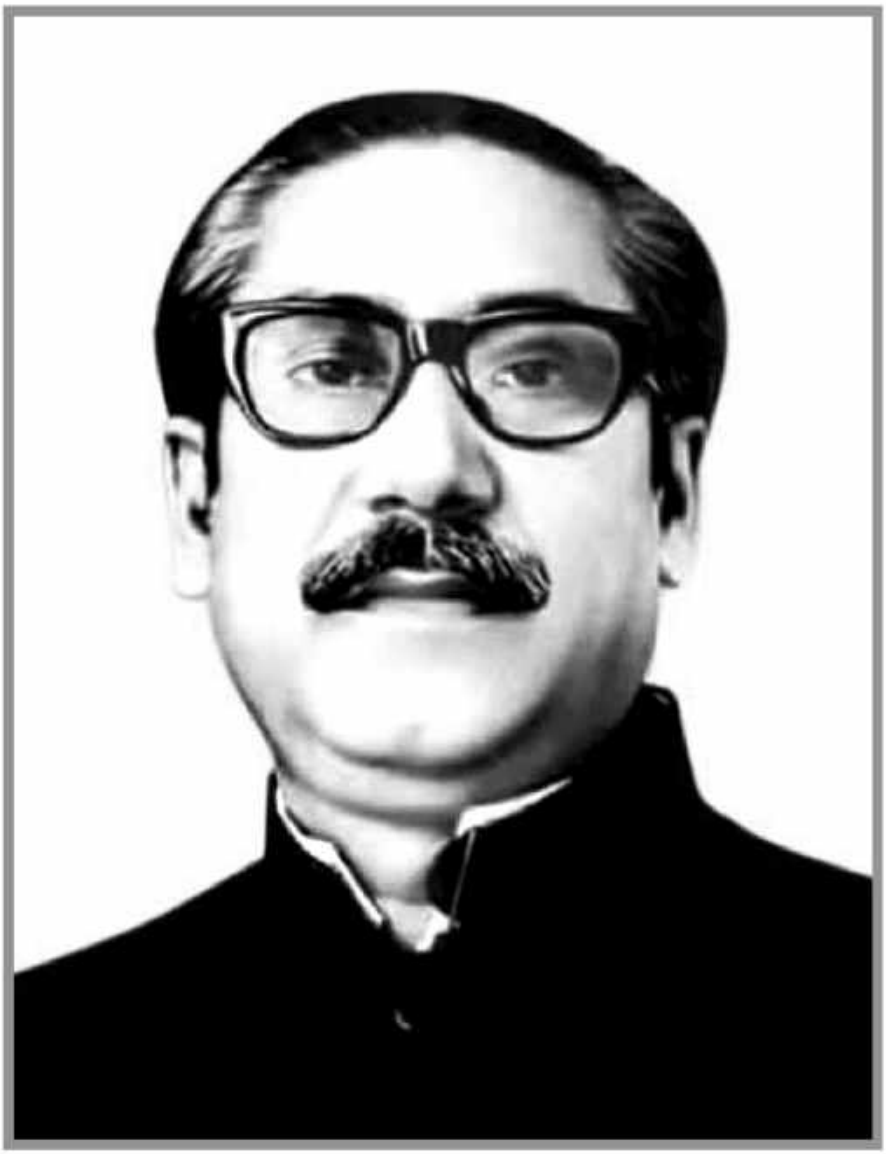

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২

#CareInCrises

"Addressing drug challenges in health and humanitarian crises"

"মাদক সেবন রোধ করি
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

#CareInCrises

"Addressing drug challenges
in health and humanitarian crises"

''মাদক সেবন রোধ করি
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি''

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বেই কমবেশি মাদকের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোনো দেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা ও মাদকের অপব্যবহার বেড়ে গেলে সে দেশের নিরাপত্তা, সুশাসন, অর্থনীতি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। মাদকের অপব্যবহার ও পাচার রোধে সম্মিলিত উদ্যোগ খুবই জরুরি। বৈশ্বিকীকরণের প্রভাব ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষ তথা ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রায় যেমন ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তেমনি প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারীরা মাদকের উৎপাদন, বিপণন ও পাচারে তথ্যপ্রযুক্তিকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে মাদক পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে মাদকসহ অনেক জীবননাশকারী দ্রব্য সহজেই মাদকসেবীদের হাতের নাগালে চলে আসছে। বর্তমানে যুব সমাজ ট্র্যাডিশনাল ড্রাগস গ্রহণের পরিবর্তে সিনথেটিক ড্রাগস এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে যা শরীরের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমি আশা করি নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধের পাশাপাশি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশের যুবসমাজ।

বর্তমান সরকার মাদকের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" ঘোষণা করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। মাদকাসক্তদের যথাযথভাবে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'National Guideline for Management of Substance Use Disorders, Bangladesh' প্রণয়ন করা হচ্ছে। দেশের যুবসমাজকে মাদকের নীল দংশন থেকে রক্ষা করতে সমাজের সকল স্তরে মাদকের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। মাদকের বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্ত পারিবারিক বন্ধন সন্তানকে মাদক ও জঙ্গিবাদের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখে, তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা সরকার গঠনের পর মাদক নিয়ন্ত্রণে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করি। মাদক অপরাধ দমনে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' ঘোষণা অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত আইন যুগোপযোগী করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত বেসরকারি পরামর্শকেন্দ্রগুলোকে সরকারি অনুদান প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা বাড়াতে বিদ্যমান সরকারি কেন্দ্রগুলোতে শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণসহ ঢাকার বাইরে সাতটি বিভাগে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

মাদক নির্মূল করার জন্য আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাদকের চাহিদা অচিরেই অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বর্তমান বিশ্বে যে কয়েকটি সমস্যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে এর মধ্যে মাদক সমস্যা অন্যতম। কোন দেশই মাদকের ভয়াল থাবা থেকে নিরাপদ নয়। দেশভেদে এ সমস্যার তীব্রতা কম বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশও মাদক সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত নয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদক সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও সর্বোপরি জাতি গঠনের মৌলিক কাঠামোতে আঘাত হানতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ জনমিতিক সুবিধাজনক অবস্থানের (Demographic Dividend) সুফল ভোগ করছে, মূলত আমাদের অপার সম্ভাবনাময় তরুণ তথা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কারণে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো আন্তার্জাতিক মাদক চোরাকারবারীরা আমাদের তরুণ সমাজকে টার্গেট করে আমাদের দেশকে মাদকের বাজার বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে আমরা মাদক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ মাদকের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। প্রয়োজনের নিরিখে সংস্থাসমূহ সময়ে সময়ে মাদকবিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করছে।

শুধু অভিযান পরিচালনা করে মাদক সমস্যার সমাধানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও আসতে পারে। মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে যত বেশি সচেতন করা যাবে ততই এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ সহজ হবে। আমাদের সমাজের যে অংশ ইতোমধ্যে মাদকের নীল দংশনে সর্বস্ব হারিয়েছে সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে সামাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনাও আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো অর্থবহ, সুসমন্বিত ও কার্যকর করা সম্ভব। যে জাতি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার লাল সূর্য ও লাল-সবুজের পতাকা উপহার দিতে পারে, সে জাতি মাদকের কাছে মাথা নত করতে পারে না। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা মাদক প্রতিহত করবোই।

২৬শে জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে এ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি

সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

২৬ জুন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। যুব সমাজকে মাদকের আগ্রাসন হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে স্যুভেনির ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার জন্য অধিদপ্তরের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মাদকের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। বিশ্বব্যাপী মাদকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব আজ সোচ্চার। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। মাদকের ভয়াবহতা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ২৬শে জুন দিবসটি পালন করতে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজা ও ইনজেক্টিং ড্রাগের অপব্যবহার বেশি লক্ষণীয়। এ সমস্যা সমাধানে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো বেশি সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তি-নির্ভর অভিযানের মাধ্যমে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে থাকা খলনায়কদের আইনের আওতায় আনতে পারলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল সদস্যকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লড়াকু সৈনিকে পরিণত করতে পারলে মাদক নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজতর হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাদকের বিরুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হতে হবে।

মাদকাসক্তদের অপরাধী হিসেবে বিবেচনা না করে তাদেরকে রোগী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সমাজের এ শ্রেণিকে চিকিৎসার মাধ্যমে আলোকিত জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলে তারা দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের পরিধি আরো বিস্তৃত করতে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রকেও এগিয়ে আসতে হবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি মাদকের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের হাত থেকে যুব ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করা সকল শ্রেণি, পেশা ও নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ দেশের সকল নাগরিক তথা সকল পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, ইমাম, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে বর্তমান সরকার গৃহীত 'ডোপ টেস্ট' কার্যক্রমের আওতায় এনে ডোপ টেস্ট কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য অবব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আমি এই দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শামসুল হক টুকু, এম.পি

বাণী

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার প্রারম্ভের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। উন্নয়নের অনেক সূচকেই বাংলাদেশ আজ বহির্বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমাদের এই অগ্রযাত্রায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং এটি আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেকোন মূল্যেই মাদকের থাবা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। মাদকের আগ্রাসন যেন কোনভাবে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ম্লান না করে সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাদকের গ্রাসে আছন্ন। এর একদিকে রয়েছে গোল্ডেন ট্রায়াংগেল ও অন্যদিকে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট। অবস্থানগত কারণে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্র বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহারের অপচেষ্টা চালিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে "শূন্য সহিষ্ণুতা" ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোন একক সংস্থার পক্ষে মাদক সমস্যার মোকাবেলা করা কঠিন। তাই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা একযোগে কাজ করছে।

মাদক সমস্যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে ২০০৬ সালে ও মায়ানমারের সাথে ১৯৯৪ সালে দুইটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মাদকের অবৈধ পাচাররোধে ভারতের সাথে এখন পর্যন্ত ০৭ টি ও মায়ানমারের সাথে ০৪ টি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও মাদকবিরোধী কঠোর নীতিমালা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন

বাণী

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার ও মাদকাসক্তি বর্তমান সময়ে আলোচিত সমস্যাগুলোর একটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের যুব সমাজ মাদক ব্যবসায়ীদের মূল টার্গেটে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও মাদক সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে ভৌগোলিক কারণে। প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটছে। আমাদের দেশের সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আন্তঃদেশীয় মাদক পাচারকারী চক্র আমাদের দেশে মাদক পাচার করে থাকে। মাদক সমস্যা শক্তভাবে প্রতিহত করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কাজ করছে। আন্তঃসংস্থার যথাযথ সমন্বয় সাধন ও পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সাফল্য দৃশ্যমান হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনী সফল অভিযান পরিচালনা করছে। শুধু আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনা করে মাদক সমস্যার বিলোপ ঘটানো দুরুহ বিষয়। বিশ্বের অনেক শক্তিশালী ও উন্নত দেশও শুধু অভিযান পরিচালনা করে সফলভাবে মাদক সমস্যার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মেধা ও মননে মাদক গ্রহণের নেতিবাচক পরিণতির বার্তা এঁটে দিতে পারলে মানুষ মাদক থেকে দূরে থাকবে-এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। ইতোমধ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দেশব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। অধিদপ্তর গণমানুষকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মাদক-বিরোধী ডিজিটাল প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেও অধিদপ্তর মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করছে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ মাদকাসক্তিকে অপরাধ বিবেচনা না করে মস্তিকের রোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং মাদকাসক্তদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর এবং দেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পর্যাপ্ত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সেলরদের অভাব রয়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে "National Guideline for the Management of Substance Use Disorders, Bangladesh" প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২৬ জুন "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস" পালনের এই শুভক্ষণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ দিবসকে কেন্দ্র করে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আজিজুল ইসলাম

সম্পাদকীয়

আসক্তি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুণে মাদকদ্রব্য সমগ্র মানবজাতিকে এর অপব্যবহারের বলয়ে ক্রমাগত টেনে আনছে। এর ফলে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অপরাধমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের মানবসম্পদের একটি বড় অংশ-বিশেষ করে আমাদের তরুণ ও যুবসমাজ মাদকের অপব্যবহারের প্রধান শিকার। নেশার কবলে পড়ে তারা কর্মশক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলছে। বিশ্বব্যাপী মাদকের অবাধ বিস্তাররোধে ১৯৮৮ সন থেকে প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আর্ন্তজাতিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Addressing drug challenges in health and humanitarian crises" যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে ''মাদক সেবন রোধ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি''। মাদকের অপব্যবহারজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও মানবিক বিপর্যয় রোধে মাদক নির্মূলের চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরে তা মোকাবিলার পন্থাসমূহ খুঁজে বের করাই এবছর দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আর্ন্তজাতিক দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও একটি স্যুভেনির প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- যার লক্ষ্য হলো মানুষের বিবেকের জাগরণ ও সচেতনতার বিকাশ। আর এ কাজে লেখনীর কোনো জুড়ি নেই। অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাদক বিষয়ক তথ্য নিয়ে বুলেটিন প্রকাশের পাশাপাশি বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ করা হলেও গবেষণা ও সমীক্ষাধর্মী লেখা নিয়ে এ দিবসকে কেন্দ্র করে একটি মাত্র স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ বছর স্যুভেনির প্রকাশের জন্য সর্বসাকুল্যে ১৩টি লেখা পাওয়া গেছে। এ লেখাগুলোকে বিষয়, বক্তব্য, তথ্য, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে যতটুকু সমৃদ্ধ করা যায় তা চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা আগামীতে আরো ভালো লেখায় এ প্রকাশনা সমৃদ্ধ হবে।

এ স্যুভেনিরে প্রকাশিত লেখাগুলোর বক্তব্য, দর্শন, ভাবধারা, মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, কিংবা সম্পাদনা পর্ষদের কোনো সংশ্রব বা দায়বদ্ধতা নেই। আমরা প্রকাশনা বিশেষজ্ঞও নই। আমাদের আন্তরিক সুচেষ্টা ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রকাশনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। আশাকরি পাঠকগণ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। স্যুভেনিরটি যদি মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে গতিময়তা এনে আমাদের তরুণ ও যুবসমাজকে কিছুটা হলেও আলোর সন্ধান দিতে পারে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো। এ প্রকাশনার বিষয়ে সুধীজনের যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমাদের আগামী দিনের পাথেয় হবে। এ স্যুভেনিরে যাঁরা লেখা দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, কিংবা অন্য কোনোভাবে অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
ও
সম্পাদক, স্যুভেনির সম্পাদনা পর্ষদ

স্যুভেনির সম্পাদনা পর্ষদ ২০২২

আহবায়ক

মোঃ আজিজুল ইসলাম
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সদস্য

মোহাম্মদ আবু তালেব
প্রাক্তন পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
এবং ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ইউএনওডিসি

কাজী আল আমিন
অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা

শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ জাফরুল্ল্যাহ কাজল
অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মোঃ আহসানুর রহমান
উপপরিচালক (অপারেশনস্)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির
পরিদর্শক
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা

সদস্য সচিব

রামেশ্বর দাস
সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০২২
প্রকাশনায় ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
E-mail: dgdncbd@gamil.com, www.dnc.gov.bd

মুদ্রণে ঃ ভিশনারী প্রিন্টিং সার্ভিসেস
২৫৮, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
E-mail: vpsmatt7@gmail.com

স্যুভেনির সম্পাদনা পর্ষদ ২০২২

মোঃ আজিজুল ইসলাম

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ

মোহাম্মদ আবু তালেব

মোঃ জাফরুল্ল্যাহ কাজল

কাজী আল আমিন

মোঃ আহসানুর রহমান

মোঃ রবিউল ইসলাম

মোঃ মানজুরুল ইসলাম

শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম

রামেশ্বর দাস

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির

সূচিপত্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম ০১-২৭
মোঃ আজিজুল ইসলাম
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা: একটি মাইলস্টোন ২৮-৩২
মোহাম্মদ আবদুল হাই,পিএএ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বাংলাদেশে মাদক গোয়েন্দা কার্যক্রমের ইতিহাস ও পটভূমি ৩৩-৪০
মোহাম্মদ আবু তালেব
প্রাক্তন পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
এবং কনসালট্যান্ট, ইউএনওডিসি

মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রয়োজন সকলের অঙ্গীকার ৪১-৪৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী

Role of Meditation And Yoga In Treatment of Substance Use Disorder ৪৮-৫৩
Prof. Dr. Mahadeb Chandra Mandal
Former Director, NIMH

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে শিল্পে ও অবৈধ মাদকদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ৫৪-৫৮
মোঃ নজরুল ইসলাম সিকদার, অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই

Falsified Medical Products Crime Prevention and Criminal Justice ৫৯-৬৪
Dr. Dulal Krishna Saha, Chief Chemical Examiner
Department of Narcotics Control

তারুণ্য ও মাদকাসক্তি ৬৫-৬৭
মোঃ আহসানুর রহমান
উপপরিচালক (অপারেশনস্)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

Drug Prevention Interventions & Bangladesh ৬৮-৭১
Md. Manjurul Islam
Deputy Director
Department Of Narcotics Control

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধে তরুণ সমাজ ও পরিবহণ মালিক-শ্রমিকের ভূমিকা ৭২-৭৯
মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

কেমন হবে আগামী দিনের মাদকাসক্তের চিকিৎসা ৮০-৮২
মো: মেহেদী হাসান
উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, গাজীপুর

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক দায়িত্ববোধ: পারিবারিক অনুশাসন ও নৈতিকতা ৮৩-৮৫
শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম
সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

ঔষধ হিসেবে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ৮৬-৮৯
মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির
পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা

গ্যালারি ৯০-৯৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম

মোঃ আজিজুল ইসলাম

মহাপরিচালক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

ভূমিকা

বিশ্বজনীন সমস্যাসমূহের মধ্যে মাদক একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা। এটি সমগ্র মানব জাতির জন্য চরম অভিশাপ। বহুকাল ধরে এ সমস্যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড ছেড়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এর কালো থাবা বিস্তার লাভ করেছে। এশিয়া থেকে ইউরাপে, লাতিন আমেরিকা থেকে ওশেনিয়া-দেশে দেশে, নানা নামে বাহারি মাদকের উপস্থিতি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর কষ্টের শেষ নেই মাদকাসক্ত পরিবারগুলোর। সরকার, সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাদক সমস্যার সমাধানে কাজ করছে। কারণ ব্যাপক বিস্তৃত এই মাদক নির্মূল খুবই জটিল ও কঠিন চ্যালেঞ্জের একটি প্রক্রিয়া।

উদ্বেগের বিষয় হলো মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম যেকোন দেশে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই তা বিপন্ন করছে বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি। মাদক শুধুমাত্র মাদকসেবী ও বর্তমান প্রজন্মকে নয়, মাদক বিপন্ন করে তুলেছে ব্যক্তি, পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও। সমাজে তৈরি করছে অস্থিরতা, বাড়াচ্ছে বিভিন্ন অপরাধ।

জাতীয় অর্থনীতি ও সুষ্ঠু সামাজিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ হচ্ছে বিপথগামী। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতার পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ভৌগোলিকভাবেই বাংলাদেশ মাদকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। সীমান্ত-সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে মাদকের কারখানা গড়ে উঠেছে বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। কঠিন এই বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের জন্য মাদক নির্মূল আরও বেশি চ্যালেঞ্জের। এছাড়াও ডার্কওয়েব ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের অপব্যবহার করে মাদকের কেনা বেচা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাদকদ্রব্যের পাচার রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিজস্ব গবেষণা, নীতিমালা ও কৌশল প্রয়োগ করে মাদকের আগ্রাসন কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। অধিদপ্তর মনে করে, শুধু আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়, মাদকের চাহিদা হ্রাসে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন জরুরি। মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা যেমন বাড়াতে হবে, সেই সঙ্গে কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসাও নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে হবে।

১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। এর লক্ষ্য হলো মাদকের অপব্যবহার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তির চিকিৎসার বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দিবসটি পালনের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এবছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় Addrissing drug challenges in health and humanitarian crises- যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে ''মাদক সেবন রোধ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি''

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপট ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। পূজা-পার্বণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং বিনোদনে এদেশের অনেক আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মদ, তাড়ি, পঁচুই ও গাঁজা-ভাং-এর প্রচলন ছিল। উপজাতীয় সংস্কৃতিতে জগরা, কানজি ও দোচোয়ানি ইত্যাদির ব্যবহার এখনও রয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে প্রথম আফিম চাষ ও ব্যবসা শুরু করেছিল। এ নিয়ে একটি ফরমান জারি ও কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদন করে চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো। তারা এ দেশে আফিমের দোকান চালু করে। ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালে আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন ও আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮৭৮ সালে আফিম আইন সংশোধন করে। পরবর্তীতে গাঁজা ও মদ থেকেও রাজস্ব আদায় শুরু হয় এবং ১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আফিম, মদ ও গাঁজা ছাড়াও আফিম ও কোকেন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের মাদকের প্রসার ঘটলে ১৯৩০ সালে সরকার The Dangerous Drug Act, 1930 প্রণয়ন করে। একইভাবে সরকার আফিম ধূমপান নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৩২ সনে The Opium Smoking Act, 1932 প্রণয়ন এবং ১৯৩৯ সালে The Dangerous Drug Rules, 1939 প্রণয়ন করে। ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৬ সালে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারা বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন-কল্পে ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি করা হয়। ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমন, এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, আইনের প্রয়োগ, মাদকদ্রব্যসমূহ আইনের তফসিলভুক্তকরণ, ওষুধ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত প্রিকারসার কেমিক্যাল আমদানির লাইসেন্স প্রদান, আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যবহারসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং, উৎপাদিত মাদকজাতীয় ফিনিশড প্রোডাক্ট পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নোডাল (প্রধান) সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বোচ্চ সাজার বিধান রেখে আইন প্রণয়নসহ প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াতে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এখন আরও বেশি দক্ষ ও কার্যকর।

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

ভিশন : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধ, এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৩। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Draft Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দেশকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম আরো জোরদার করা, সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Draft Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করে Need based কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। ইতোমধ্যে সকল বিভাগে এবং অধিকাংশ জেলায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে । এ খসড়া কর্মপরিকল্পনাটি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করে Need based কর্মপরিকল্পনা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় হতে চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

৪। মাদক নির্মূলে বহুমুখী কার্যক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮-তে "আরোগ্যের প্রয়াজেন বা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" মর্মে বর্ণিত রয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction), সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction), এবং ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)-এই তিনটি পদ্ধতিতে মূলতঃ মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

৫। চাহিদা হ্রাস বা নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম (Demand Reduction)

মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে-

১. জনসচেতনতায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রমে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা।

২. সারাদেশে মাসব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান।

৩. দেশজুড়ে মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন, ডিজিটাল প্রচার কার্যক্রম

৪. সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

৫. ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার

৬. সোস্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম

৭. প্রচারে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

৯. মাদককে না বলা কর্মসূচি

১০. মাঠ পর্যায়ে মাদক সচেতনতা সৃষ্টি

১১. স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব" শীর্ষক তথ্য সম্বলিত জ্যামিতি বক্স ও স্কেল বিতরণ
১২. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডি বিলবোর্ড ও কিয়স্ক স্থাপন।

মাদকবিরোধী জনসচেতনতায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম ও এতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা

মাদক নিয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলে সারা বছরই। তবে ২০১৬ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, আইজিপি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মাসব্যাপী প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠোন বৈঠক, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মাদকবিরোধী প্রচার কাজের পরিসংখ্যান

ক্র. নং.	কাজের বিবরণ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
০১	মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	১,৫৭,৭৮৫ টি	১,৬৪,২৩৬ টি	--	--	--	৩২,৭৭৫টি
০২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	৯,৪৭,৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯ টি	১৪,২০,০০০ টি	২,৬৫,০০০ টি	--	১৮,০০০,০০ টি
০৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	৭৫,১৩১ টি	৮,০০০ টি	--	৯৫০০টি	--	৪১,১৮০ টি
০৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,৬০৭ টি	৭,২৬১ টি	৮,৮৯৮ টি	৪,৪৭৫টি	২৪৮৩টি	৬,১৬১ টি
০৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেনি বক্তৃতা	১,৪৬৯ টি	২,৪৬০ টি	৫,৪৪৭ টি	১৫৭৩৫টি	১৬৭০টি	৩,৮৪৯ টি
০৬	স্যুভিনির প্রকাশ ও বিতরণ	২,০০০ টি	২,৬০০ টি	২,২০০ টি	৩০০০টি	১২০০টি	৩,০০০ টি
০৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮,৩৩৫ টি	১৮৭২ টি	১,৯৪১ টি	২২০০টি	৫৬০টি	১৭৮ টি
০৮	মাসিক বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	১৮,০০০ টি	১৮,০০০ টি	৯,০০০ টি	--	--	--
০৯	মাদকবিরোধী এ্যাম্বুশ পিভিসি পোস্টার	--	--	--	২৬,৫০০টি	--	৩২,৭৭৫টি
১০	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	--	--	৪০,০০০টি	২০৩৮০টি	১২৮৭৬টি	৩,৭২০ টি
১১	কারাগারে আয়োজিত মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ	--	--	--	২৭২টি	৭৪টি	২৩৬ টি
১২	মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম(স্থানের সংখ্যা)	--	--	১৪৮২টি	৮৪৬টি	১৬১টি	২২০ টি
১৩	মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন	--	--	--	২০টি	১০টি	২৪ টি
১৪	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রদান	--	--	--	৮১টি	২৮টি	১৮ টি
১৫	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	১৮০০০টি	১৮০০০টি	৯০০০টি	৩০০০টি	১৫০০টি	---
১৬	বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ ও বিতরণ	১২০০টি	১২০০টি	১২০০টি	১২০০টি	১২০০টি	১২০০ টি

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন বিতরণ

শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০,০০০টি ফেস্টুন তৈরি করে ১৮,৯০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে। ২০১৯ সালে ২০৩৮০টি এবং ২০২০ সালে ১২৮৭৬টি এবং ২০২১ সালে ৩৭২০টি ফেস্টুন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারি বেসরকারি দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে।

সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি

ধারাবাহিকভাবে সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও জনসমাগম স্থলে নিয়মিত সভা-সমাবেশ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়/ মেট্রো কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪২৩২টি, কারাগারসমূহে ২০০টি ও অন্যান্য স্থানে ৫১৪৬টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়, মেট্রো কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২১ সালে ১৮,০০,০০০টি মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ৩০০টি স্যুভেনির ও ১২০০টি বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়মিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকর কমিটি গঠন করা হয়েছে। মে, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি (TOR) এবং সুনির্দিষ্ট একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণে আলোচনার জন্য কনটেন্ট/মডিউল তৈরি করা হয়েছে; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে বিদ্যমান বিষয়সমূহ আরও উন্নত ও তথ্যনির্ভর করা হচ্ছে; মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মাদক সংক্রান্ত নানান বিষয় হালনাগাদ করা হচ্ছে। উপজেলা, জেলা ও মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের আলাচেনা সভায় Recovered Addict-দের অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং Recovered Addict-দের নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটি মাদকমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সারা দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন ও কর্মসূচি গ্রহণ চলমান আছে। দ্রুত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন শেষ হবে।

সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান (জুন/ ২০২১ পর্যন্ত]

ক্র. নং	বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গঠিত কমিটির শতকরা হার (%)
০১	ঢাকা	৪,৯২১টি.	৪,৯২১টি	--	১০০%
০২	চট্টগ্রাম	৪,৮৪৯টি	৪,৮৪৮টি	১টি	৯৯.৯৭%
০৩	রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫,১১৯টি	--	১০০%
০৪	খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪,৪৯৭টি	--	১০০%
০৫	বরিশাল	৩,০১৮টি	৩,০১৮টি	--	১০০%
০৬	সিলেট	১,৪৯১টি	১,৪৯১টি	--	১০০%
০৭	রংপুর	৪,৮০০টি	৪,৭০২টি	৯৮ টি	৯৭.৯৫%
০৮	ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২,৪৮৪টি	--	১০০%
	মোট :	৩১,১৭৯ টি	৩১,০৮০ টি	৯৯ টি	৯৯.৬৮%

ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী টিভিসি (বিজ্ঞাপন), থিম সং, নাটক, নাটিকা ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে একাধিক টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন নামীয় ২০ পর্বের মাদকবিরোধী টকশো নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করায় জনসচেতনতা বাড়ছে। তাছাড়া বিভিন্ন মিডিয়ায় মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।

সোস্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াকে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে। কারণ, এখানে নানা শ্রেণি পেশার মানুষের উপস্থিতি ঘটে। বিশেষ করে তরুণরা সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক-ভাবে জড়িত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যেকোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অধিদপ্তরের Facebook page-এর মাধ্যমে প্রকাশ করছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং Facebook সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যেকোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে Facebook-এ সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন।

মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রমে LED বিলবোর্ড ও কিয়স্ক (KIOSK) এর ব্যবহার

মাদকবিরোধী প্রচারের নতুন সংযোজন এলইডি কিয়স্ক ডিসপ্লে ডিভাইস, যা একটি এলইডি ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ। প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি করে কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ০৫টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে(ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুষ্টিয়া) " Full Coloured Outdoor LED Display Billboard " স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ০৫টি Billboard এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ প্রচার করা হচ্ছে।

মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স ও স্কেল বিতরণ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাদকের ভয়বহতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স ও স্কেল বিতরণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা

মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এক্ষেত্রে মসজিদের ইমামগণ যাতে জুমার নামাজের সময় খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে, জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মাদককে 'না' বলা কর্মসূচি

মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হচ্ছে মাদককে 'না' বলা কর্মসূচি। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুমোদিত Action Plan অনুযায়ী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ মিনিট স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে মাদকের বিরুদ্ধে না বলা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে প্রণীত এ্যাকশন প্লান অনুয়ায়ি জেলা-উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলায় ৪টি উপজেলা, নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলা এবং অবশিষ্ট ৭টি বিভাগের ১টি করে উপজেলা নিয়ে মাটে ১৪টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলাসমূহকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে এ্যাকশন প্লান অনুযায়ি মাদকবিরোধী উপজেলা প্রচার কমিটিকে কার্যকর করা হয়েছে এবং উপজেলাগুলোতে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত ৪০ হাজার ফেস্টুন তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন জনসম্পৃক্ত সরকারি দপ্তরে বিতরণ করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা বাড়ানোয় বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ ও তরুণ-তরুণী এখন মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

৬। ভিন্ন আঙ্গিকে টিভি মিডিয়ায় প্রথমবারের মতো রমযানে মাসব্যাপী প্রচারণা কার্যক্রম

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসে সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমন্বিত চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Draft Action Plan) প্রণয়নে ভার্চুয়াল টিভি মিডিয়ায় পিকআওয়ারে প্রথমবারের মতো পবিত্র রমযানে মাসব্যাপী মাদক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক স্কুল নিউজ/টিভিসি /এলসপ-পপআপ টিভিসি একযোগে ৩০টি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে।

৭। সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) কার্যক্রম

মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনা অত্যন্ত জটিল কাজ। কারণ বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয়। প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে নানাভাবে দেশে মাদক ঢুকছে। মাদক কারবারীরা নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে চায়। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী করে থাকে-

* দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন ।
* মাদকের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশি করা ।
* মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা।
* মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা ।
* অভিযানিক কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন।
* মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs).
* INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, সহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, প্রশিক্ষণ ও কাজের সমন্বয় সাধন।
* দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
* মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সারাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ২টি মেট্রো উপ-অঞ্চল ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্ট গার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন, বাস, স্টিমার, লঞ্চ, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়াগেকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

নিয়মিত অভিযান, মামলা ও আলামত জব্দের পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানুয়ারি-এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত মাদকবিরোধী ৩৩,৯৭৮ টি অভিযান পরিচালনা করে ৮,৭০৭ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ৮,০০৭ টি মামলা দায়ের করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০ সালে মোট ৬৫,১৩৯ টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ১৮,৩২১ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ১৭,৩০৪ টি মামলা দায়ের করেছে। উক্ত সময়ে উদ্ধার উল্লেখযোগ্য আলামতের বিবরণ নিম্নরূপ :

ইয়াবা ২০,২৬,৪৯৮ পিস, হেরোইন ৮.৯৫০ কেজি, গাঁজা ২৭৪২.২৫০ কেজি, গাঁজা গাছ ২৬৮টি, ফেন্সিডিল ৩০৬৩২ বোতল, ফেন্সিডিল তরল ২৯.৭ লিটার, দেশি মদ ৫১৬.৭৫ লিটার, চোলাই মদ ১০,৪৪৬.১২ লিটার, জাওয়া ৯১,৮১০.৫ লিটার, ইনজেক্টিং ড্রাগ ২১,০৮৫ অ্যাম্পুল, বিদেশি মদ ২৩১৭ বোতল, বিদেশি মদ ১৫৫.৮৪ লিটার, বিয়ার ৫৫৮৭ ক্যান ও বিয়ার ৩৮৪ বোতল।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২১ সালে মোট ৮৪,৫৬২ টি অভিযান পরিচালনার করে ২১,৯৯২ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ২০,৫৯২ টি মামলা দায়ের করেছে। উক্ত সময়ে উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য আলামতের বিবরণ নিম্নরূপ:

ইয়াবা ৩৪,৬৭৯৯২ পিস, হেরোইন ১১.৮১৯ কেজি, গাঁজা ৪৪১৭.৬৬৮ কেজি, গাঁজা গাছ ৬৬৩ টি, ফেন্সিডিল ২২,১৯১ বোতল, ফেন্সিডিল তরল ২.১০৮ লিটার, দেশি মদ ১১৭ লিটার, চোলাই মদ ১০,১১৯.০৫৯ লিটার, জাওয়া ১,১২,৭৩৩ লিটার, ইনজেক্টিং ড্রাগ ৩১,২২৯ অ্যাম্পুল, বিদেশি মদ ১৭৬৪ বোতল, বিদেশি মদ ৪৬.৬৯ লিটার ও বিয়ার ৬২৭ ক্যান।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানুয়ারি-এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত মাদকবিরোধী ৩৩,৯৭৮ টি অভিযান পরিচালনা করে ৮,৭০৭ জন মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে ৮,০০৭ টি মামলা দায়ের করেছে। উক্ত সময়ে উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য আলামতের বিবরণ নিম্নরূপ: ইয়াবা ১৬,৪৪,২৮৪ পিস, হেরোইন ৩.৪১৮ কেজি, গাঁজা ২৯১০.২৩৯ কেজি, গাঁজা গাছ ৬৭ টি, ফেন্সিডিল ১২,৬১১ বোতল,

চোলাই মদ ৩০৫৯.২৫৭ লিটার, জাওয়া ২১,৮৭৫ লিটার, ইনজেক্টিং ড্রাগ ২৩,৫০৫ এ্যাম্পুল, বিদেশি মদ ৭৭১ বোতল, বিদেশি মদ ৫.৭৫ লিটার, বিয়ার ৭৬৯ ক্যান।

ক. ২০১৪-২০২২ (এপ্রিল মাস পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত আসামীর পরিসংখ্যান

বছর	মামলা	আসামী
২০১৪	১১,৭২৩	১২,৫৯০
২০১৫	১০,৫৪৮	১১,৩০০
২০১৬	৯,৭৭৩	১০,৪৬৫
২০১৭	১১,৬১২	১২,৬৫১
২০১৮	১৩,৭৯৩	১৫,১১৬
২০১৯	১৭৩০৫	১৮৩৪৬
২০২০	১৭৩০৪	১৮৩২১
২০২১	২০৫৯২	২১৯৯২
২০২২ (এপ্রিল)	৮০০৭	৮৭০৭

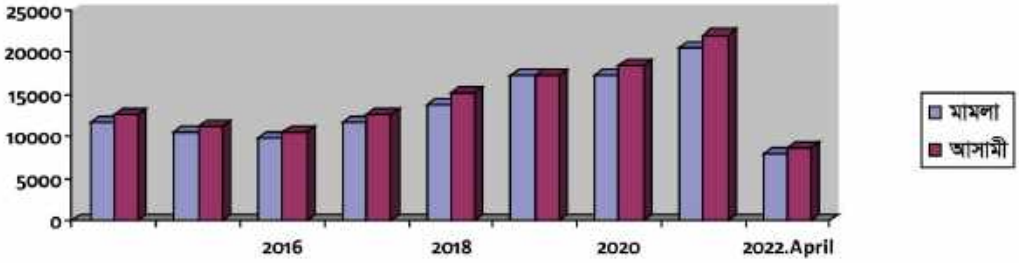

খ. ২০১৪-২০২২ (এপ্রিল মাস পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক জব্দকৃত মাদকের বিবরণ

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল (লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৪	-	৩৩,৭৫১	৪৫.৪১৮	৬.৫১	১০,৯৫৭	৪,৫৫১ কেজি	৯,৩০১	৬,৭৬,১৪৩
২০১৫	৫,৩০০	৩০,৮১৮	৩৮৩.৫	১১.৩০২	৮,০১৩	৪,৪৫৫ কেজি ৪৭ টি	২২,৩২৫	৩৩,৭৯,৮৮০
২০১৬	-	২৪,৪৮৩	১৯২.৫	৮.৪৭৪	৪,৮৩৭	৩,৩৫০ কেজি ৬২৩টি	১২,৩৩১	১৩,১৪,৭৫৯
২০১৭	-	৩০,৬০১	৩১.৬২	১৯.৩৯৫	৬,৩১০	৪,২৩৫ কেজি ২২১টি	১৪,৭৬০	১১,৫৮,৭৭০
২০১৮	০.৭৫	২৩,৪৭৬	১০.৮	১৩.২৯৭	৩,০০৯	২৮৫৮ কেজি ৩৯ টি	৬৪,২৫৬	২৫,৯৩,৯৮৩
২০১৯	-	২৪,৭৭৪	১৭.০৫	৯.৯৩৪	৩,৫৪৬	১৮২৫.৫২৯ কেজি ৭৬টি	১৩,৬২৭	১১,৪৮,৪৯৯
২০২০	-	৩০,৬৩২	২৯.৭	৮.৯৫০	২,৩১৭	২৭৪২.২৫০কেজি ২৬৮টি	২১,০৮৫	২০,২৬,৪৯৮
২০২১	-	২২,১৯১	২.১০৮	১১.৮১৯	১,৭৬৪	৪৪১৭.৬৬৮কেজি ৬৬৩ টি	৩১,২২৯	৩৪,৬৭,৯৯২
২০২২ (এপ্রিল)	-	১২,৬১১	২.১	৩.৪১৮	৭৭১	২৯১০.২৩৯কেজি ৬৭ টি	২৩,৫০৫	১৬,৪৪,২৮৪

গ. সব সংস্থা (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড) কর্তৃক ২০১৪-২০২২ (এপ্রিল পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত সময়ে আটক উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল) টি	কোডিন (ফেন্সিডিল (লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল) টি	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ (এ্যাম্পুল)টি	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
২০১৪	২.০৮৫	৭৪১১৩৭	৪৩৮.২১৮	৭৮.৩০৩	২৯৩২৫৪	৩৫৯৮৮.৫৬ ৭২৭	১৭,৮৮৯	৬৫,১২,৮৬৯
২০১৫	৫.৭৭৮	৮৭০২১০	৫১০৪.৭৫	১০৭.৫৩৯	৩২২৫৮৯	৩৯৯৬৭.৫৯৪ ৭৬১	৮৫,৯৪৬	২,০১,৭৭,৫৮১
২০১৬	০.৬২০	৫৬৬৫২৫	২৭৫.৬৮	৩৬৬.৭৮৫	২৮৪২০৪	৪৭১০৪.৬৫৫ ৮৯৪	১,৫২,৭৪০	২,৯৪,৫০,১৭৮
২০১৭	৫.০৫০	৭২০৮৪৩	৩৩৮.৭২	৪০১.৬৩৩	১৭৫৮০৬	৬৯৯৮৯.৫০৮ ৫৩৮	১,০৯,০৬৩	৪,০০,৭৯,৪৪৩
২০১৮	০.৭৫০	৭১৫৫২৯	৫৩৯.৯৫	৪৫১.৫০৬	১০৫৭১৯	৬০২৯৫.১২৪ ২৭২	১,২৮,৭০৮	৫,৩০,৪৮,৫৪৮
২০১৯	১	৯৭৬৬৬৩	১৮৩১.০৫	৩২৩.২৭৯	১১৩২৭৯	৩২৬৫৭.৬৯৯	৪১,২৩৬	৩,০৪,৪৬,৩২৮
২০২০	৩.৮৯৩	১০০৭৯৭৭	১২৯.৪	২১০.৪৩৮	১৩২৫৩৯	৫০০৭৮.৫৪৯	১,২৪,৬০৮	৩,৬৩,৮১,০১৭
২০২১	১.৫৫	৫৭৪৩০১	১০৬.৬০৮	৪৪১.২২১	২২৫৩২৮	৮৬৬৯৬.২৮১	১,১৩,০৭০	৫,৩০,৭৩,৬৬৫
২০২২ (এপ্রিল)	৩.১	২৮৭৯৪৪	২২.৩	১১৮.১৮৫	৭৮৭৫৯	৩৭১৭২.৬২৫কেজি	৬৭,২১২	১,৯৬,৪৪,৯৪৭

মাদকদ্রব্য জব্দের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, দেশে হেরোইনের অপব্যবহার বেড়েছে। গাঁজার অপব্যবহার ২০১৪-২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান ছিল, তবে ২০১৮ সাল থেকে গাঁজার অপব্যবহার কিছুটা কমছে। কোডিন মিশ্রণের (ফেন্সিডিল) পরিমাণ ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৮ সালে স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ইনজেক্টিং ড্রাগের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে ইনজেক্টিং ড্রাগের অপব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সাল থেকে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াবা উদ্ধারের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে।

ঘ. ২০১৪-২০২২ (এপ্রিল) পর্যন্ত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান

সাল	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
১	২	৩	৪	৫
২০১৪	১৪,৮১৫ টি	৭,৯৪৮ টি	৮,৩২০ জন	৮,৩২০ জন
২০১৫	১৪,৯৩৭ টি	৭,৪৮৭ টি	৭,৮২৩ জন	৭,৮২৩ জন
২০১৬	১৩,৫৪১ টি	৬,৪৩০ টি	৬,৫৯২ জন	৬,৫৯১ জন
২০১৭	১২,২১২ টি	৫,৯৯১ টি	৬,০৪৪ জন	৬,০৪৪ জন
২০১৮	১৩৮২১ টি	৬৭৭৬ টি	৬৮৬৬ জন	৬৮৬৬ জন
২০১৯	১৮৪২৪ টি	৯৪৪৪ টি	৯৪৮৪ জন	৯৪৮৪ জন
২০২০	২৩১৯৩ টি	১০৪৭১ টি	১০৪৯৮ জন	১০৪৯৮ জন
২০২১	২৮৫০৬ টি	১২১৪৭ টি	১২১৭২ টি	১২১৭২ টি
২০২২ (এপ্রিল)	৯৯৮৭ টি	৪৩৩৮ টি	৪৩৬১ টি	৪৩৬১ টি

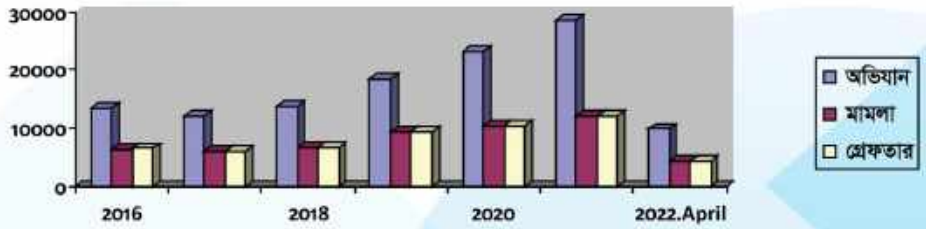

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামি			পেন্ডিং মামলা
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	মোট	
২০১৪	১৭১৬ (৬৪%)	৯৭৩	২৬৮৯	১১৭৫ (৫২%)	১১১২	২,২৮৭	৭৩,৩১২ টি মামলা
২০১৫	৮৯২ (৪৭.৬%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮.২%)	১০৪২	২,০১৩	
২০১৬	২৩৫৬ (৪২%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৩৯%)	৪২০৬	৭,১৩৩	
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২,৬৮০	
২০১৮	৫৯২ (৪২%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১,৫৪২	
২০১৯	৬৪২(৩৯%)	১০১২	১৬৫৪	৬৭৮(৩৮%)	১০৭৮	১,৭৬৫	
২০২০	৩১০(৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩(৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬	
২০২১	৬৬১(৪০%)	১০০৩	১৬৬৪	৮৫১(৫০%)	৮৪২	১,৬৯৩	
২০২২ (এপ্রিল)	৩০০ (৪৯%)	৩১১	৬১১	২৬০(৪২%)	৩৬০	৬২০	

ক. ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির অধীনে ইতোমধ্যে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সির মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ সভাটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিক চুক্তির আওতায় উভয় দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইয়াংগুনে, দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ২০১৫ সালের ৫-৬ মে ঢাকায় এবং তৃতীয় সভা ২০১৭ সালের ২০-২২ আগস্ট তারিখে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ৪র্থ সভা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে জুম অনলাইন প্লাটফর্মে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ।

গ. বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ২০১৩ সালে The Supreme Prosecutors Office (SPO), Republic of Korea-এর Narcotics Division এবং বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মধ্যে সহযাগিতামূলক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দুই দেশের দুই নোডাল এজেন্সির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় Republic of Korea মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সরবরাহ ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুমুখী সহযোগিতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে KOICA-এর সহযোগিতায় Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM it) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ. ১৯৯৫ সালে ইরাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ২০১৩ সালে নয়াদিল্লিস্থ যুক্তরাষ্ট্রের DEA অফিসের সাথে MOU সম্পাদন হয়েছে। এ সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পার্শ্ববর্তী ভারতের সাথে ২০০৬ সালে এবং মিয়ানমারের সাথে ১৯৯৪ সালে মাদকবিরোধী দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। ভারতের সাথে এ পর্যন্ত ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারত সরকার এক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। ভারত সরকারের আন্তরিকতার কারণে ভারত থেকে মাদক পাচারের প্রবণতা মহামারি আকার ধারণ করেনি ।

বর্তমান সময়ে আলোচিত মাদক ইয়াবা', যা মিয়ানমার থেকে আমাদের দেশে পাচার হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে ইয়াবা প্রতিরোধে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মিয়ানমারের সাথে এ পর্যন্ত ৪টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কার্যত কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। মিয়ানমার অংশে গোপন ইয়াবা কারখানার তালিকা হস্তান্তর করা হলেও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ সেগুলো বন্ধে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করেনি। মিয়ানমার ইতোপূর্বে

অনুষ্ঠিত ৪টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকের মধ্যে ২টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে সম্মত (Agreed) কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেনি। তারপরও এক্ষেত্রে সরকার তথা আমাদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

৮। ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction) কার্যক্রম

যেকোনো মাদক নির্ভরশীলতা এক রকম শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণে শরীরের ওজন কমতে থাকে, অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইয়াবা এবং আইসকে। বাংলাদেশে বর্তমানে মাদক হিসেবে ইয়াবা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এর ফলে কিডনি, লিভার ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে যৌনক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। রক্তচাপ বেড়ে যায়, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফেনসিডিল একসময় প্রধান মাদক ছিল। ইয়াবা আসার পর ফেনসিডিলের ব্যবহার কিছুটা কমেছে। এটি খাওয়ার কারণে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না। ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইয়াবার মতো ফেনসিডিলও যৌনক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হেরোইন সেবনে লিভার সমস্যা, ফুসফুসে সংক্রমণ, তীব্র কোষ্ঠকাঠিণ্য, কিডনি রোগ, হার্ট ও ত্বকে সমস্যা, হেপাটাইটিস, নারীদের সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা, গর্ভপাত ইত্যাদি হতে পারে। আফিম খেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যা থেকে অবচেতন হয়ে পড়া এবং বেশি পরিমাণে খেলে মৃত্যুও হতে পারে। মুখ ও নাক শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ও কোষ্ঠকাঠিণ্য হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভার সিরোসিস থেকে শুরু করে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন অনেকে। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০টি নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হতে পারে মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে। গাঁজা শিরার ক্ষতি করে, ফলে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হয়। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণে স্মৃতিশক্তির সমস্যা দেখা দেয়। স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। পুরুষের টেস্টিকুলার ক্যান্সার হতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয় এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যার বর্তমান বেড সংখ্যা ১৯৯টি কিন্তু তা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে রোগীদের থাকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। এমনকি সব সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিশেষ কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এসব চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও অভিভাবকদের সচেতনতা খুবই জরুরি।

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-পেয়িং ওয়ার্ড এবং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি পেয়িং ওয়ার্ড সম্বলিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত করে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়, যার বেড সংখ্যা ছিল ২৫ শয্যা নন-পেয়িং এবং ১৫ শয্যা পেয়িং। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০.১২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের চিকিৎসার জন্য ১০টি শয্যা বৃদ্ধি করে এ কেন্দ্রকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ৫০ শয্যার নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধাসহ বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ১২৪ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	শয্যা সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪	৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চীফ কনসালটেন্ট	অভিভাবকদের সাথে সাপ্তাহিক কনসালট্যান্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	৭/এ-১ নাছিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম	সিনিয়র কনসালটেন্ট (সাইক)	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	৪৩৯, তেরখাদিয়া, রাজশাহী	সিনিয়র কনসালটেন্ট (সাইক)	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	১২৬, এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা	সিনিয়র কনসালটেন্ট (সাইক)	

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেসরকারি পর্যায়েও মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। ২০২২ সালের মে পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে, যার বেড সংখ্যা ৪৭৫৬টি।

মাদকাসক্ত যেকোনো ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। দরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্প মূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে আন্তঃবিভাগে ৭,৭২৯ জন এবং বহির্বিভাগে ১১,৪৭৯ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে সম্প্রতি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম

১। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার গাইডলাইন তৈরি

দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই। তাই নিরাময় কেন্দ্রসমূহ তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত হতো। কিন্তু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা অতীব জরুরি। তাই জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির দ্বিতীয় সভায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ২৩.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৭ টি সভা করে গাইডলাইনের একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা এবং সভা করে উক্ত গাইডলাইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

২। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা করা যায় এব্যাপারে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে ৩ টি কর্মশালা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় কমিউনিটি লেভেল, প্রাইমারী লেভেল, সেকেন্ডারি লেভেল এবং টারশিয়ারি লেভেলে কিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন আসবে এবং একেবারে ঘরে-ঘরে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হবে।

৩। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান

২০১৮ সালে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম আরও উন্নত ও সহজলভ্য করার জন্য সরকারি সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদান প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে গত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের অনুকূলে যথাক্রমে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) এবং ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি অনুদান প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পূর্বের নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

৪। নতুন বিধিমালা প্রণয়ন

২০১৮ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ পাস হয়। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময়, পুনর্বাসন ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহ যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাই উক্ত আইনের আলোকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১ (এস, আর, ও নং-৩৪৮-আইন/২০২১, তারিখ: ১৬ নভেম্বর ২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার আলোকে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময়, পুনর্বাসন ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে। উক্ত বিধিমালার আলোকে একটি চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী বিভিন্ন কাগজপত্র এবং সক্ষমতা দেখে মাদকাসক্তি নিরাময়, পুনর্বাসন ও পরামর্শ কেন্দ্রের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে।

৫। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর ১০.০২.২০২২ তারিখের ৪৫ নং স্মারকমূলে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় মনিটরিং কমিটি ও জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বিভাগীয় মনিটরিং কমিটি ও জেলা মনিটরিং কমিটির সাথে সমন্বয় করে নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালকগণের জন্য বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শনের প্রমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে প্রকল্প গ্রহণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে 'Treatment and Rehabilitation for Substance Users Recovery and Empowerment (TREASURE)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে রয়েছে।

৭। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ

সরকারিভাবে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৮। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে "ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা ২৫০ এ উন্নীত করার প্রস্তাবনা রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি একনেকের অনুমাদেনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে রয়েছে।

৯। মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে যদি নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা না দেওয়া হয় তাহলে পুনরায় তারা মাদকাসক্ত হবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রদান করতে হয়। প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে। ফলে উক্ত পরিবার মাদকমুক্ত থাকতে পিতা-মাতার সহযোগিতা পাচ্ছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে ১১,৭৯৪ জন ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং সেবা দেয়া হয়েছে।

১০। ইকো প্রশিক্ষণ

Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সেলর এরূপ ১৪ জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। উক্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জন, ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৭ জন, ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩২ জন, ২০১৮ সালে ৩৭০ জন, ২০১৯ সালে ৪১০ জন, ২০২০ সালে ১৮৮ জন এবং ২০২১ সালে ৩০৩ জন এডিকশনাল প্রফেশনালকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করার জন্য ১০.১২.২০১৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। কিন্তু মাদকাসক্ত শিশু সংগ্রহ সহজ না হওয়ায় এ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। এছাড়া মাদকাসক্ত পথশিশুদের পথ থেকে এনে চিকিৎসা দেয়া হয়।

সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত রোগীর পরিসংখ্যান

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু	পুরুষ	মহিলা			
২০১১	৬৭৩	০	১৯১২	০	২৫৮৫	১৭০৯	৮৭৬
২০১২	২৯৭৮	৪	৭৭০৫	৬২	১০৭৪৯	৫৬৩৮	৪১১১
২০১৩	১৫৪৭	০	৬৫৪২	১৯	৮১০৮	৪১৬০	৩৯৪৮
২০১৪	২৭৭৩	১	৭৫৬৬	২৪	১০,৩৬৪	৪৯৬৮	৫৩৯৬
২০১৫	২২৩০	৮	৭২৪৩	৩	৯৫০৪	৪৩০২	৫২০২
২০১৬	৩৬১১	৪৭	৯১১৪	৪৩	১২৮১৫	৮০৮২	৪৭৩৩
২০১৭	৪৬৭৯	৭৪	৯৯০৭	২৮	১৪৬৮৮	৯১৫৩	৫০৭৬
২০১৮	৮৯০০	৮০	১৪১৬৬	৯১	২৫১৪৩	১২৯০৮	১২২৩৩
২০১৯	৭৫৮২	১০৯	১৯৮৫৯	৪৩৩	২৭৯৮৩	১৯২৮৫	৮৬৯৮
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৭১২১	৬০৮	১১০১১	৪৬৮	১৯২০৮	১১১৯১	৮০১৭

বেসরকারি পর্যায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর পরিসংখ্যান

বছর	মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
২০১২	৪৫০৯
২০১৩	৫৩৮০
২০১৪	৪৯৬৮
২০১৫	৬৯১২
২০১৬	৯৩৯৭
২০১৭	১০৬৬৭
২০১৮	১২৮৯২
২০১৯	১৩৮৫২
২০২০	১৫১৮১
২০২১	১৭৫০৭
২০২২ (মার্চ পর্যন্ত)	৪২৩৮

৯। কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে এর সুযোগ সম্প্রসারণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮(সংশোধিত ২০-২০) মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা ফি-তে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। দেশে সকল মাদক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মাদক মামলার নমুনার পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করা হয়। অধিকন্তু হাতে নাতে গৃহীত মাদক সংশ্লিষ্ট মামলার চার্জশিট ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় বর্তমান সরকার প্রতিটি বিভাগে একটি করে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য বিভাগীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ গ্লাসওয়্যার ও কেমিক্যাল সংগ্রহ করা সমাপ্ত হয়েছে। এসব পরীক্ষাগারের কার্যক্রম অচিরেই চালু করা হবে।

১. মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

২. মাদকদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি (GC-MS (Gas Chromatography-MassSpectrophotometer), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UVVIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Raman Spectrophotometer, Drug Dectecting Device 0677 সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কর্মরত পরীক্ষকদের বৈদেশিক ও আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি সহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষে KOICA মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৪. মাদকদ্রব্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষণের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের ড্রাগ টেস্টিং কিট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. পরীক্ষাগার তথ্য প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট হাতে লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে কম্পোজ করে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করায়, মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম দ্রুত গতিতে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২০১৪-২০২১ পর্যন্ত অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের পরিসংখ্যান।

সাল	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০১৪	৩৭,৮৭১	১১	৩৭,৮৮২
২০১৫	৪৩,২১৩	০২	৪৩,২১৫
২০১৬	৫০,৮০৬	০২	৫০,৮০৮
২০১৭	৬৭,৮০১	০০	৬৭,৮০১
২০১৮	৫৩৬০২	০০	৫৩৬০২
২০১৯	৩৭,৩২২	০০	৩৭,৩২২
২০২০	১৫,৯৩০	০০	১৫৯৩০
২০২১	১৭,৫৭১	০০	১৭,৫৭১

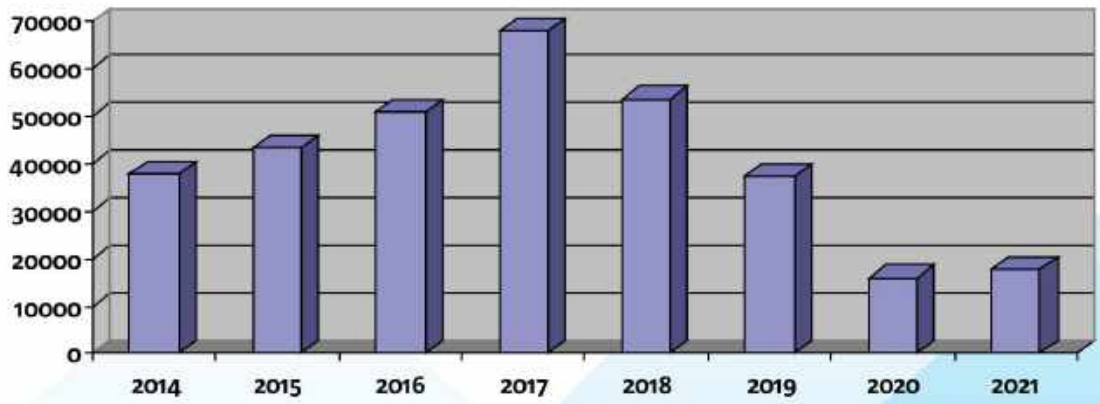

১০। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে গৃহীত পরিকল্পনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছেন। মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিবীক্ষণ করা হয়। গত ১৪ মে, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে করনীয় সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনা দান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে, ক) স্ট্র্যাটেজিক কমিটি, খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিবকে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্ট কমিটি, গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে।

১১। প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা ও নির্দেশনা : কাউকেই ছাড় দেয় না মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদক নির্মূলে "জিরো টলারেন্স" নীতি ঘোষণা করেছেন। তার এ নীতি বাস্তবায়ন করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে এ সংস্থা। নেয়া হয়েছে নতুন মাত্রার বহুমুখী পদক্ষেপ।

মাদক নির্মূলে নানা সৃজনশীল কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে সরকারের অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাদকবিরোধী কাজের সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সমাজ থেকে মাদক নির্মূলের কাজটি শুধু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একার নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ বিষয়টি অন্যান্য দায়িত্বশীল বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবিসহ অন্য বাহিনীগুলোও এখন মাদক নির্মূলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

মাদক বিষয়ে সরকারের ''জিরো টলারেন্স'' নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে যাচ্ছে। মাদক অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে কোনো ধরনের ছাড় দেয়া হচ্ছে না। সন্ত্রাস-জঙ্গি দমনে সফলতার পর দেশ থেকে মাদক নির্মূলেও কঠোর অবস্থানে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মাদক ব্যবসায়ীদের অপতৎপরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে। কী ছোট কারবারী, কী গডফ-াদার- গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে এখন কোনো ধরনের রাজনৈতিক চাপ বা বিধিনিষেধ নেই।

১২। নতুন ইউনিফর্মে সজ্জিত হচ্ছেন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

খাকি পাশোক ছেড়ে এবার নতুন পোশাকের (টার্কিশ ব্লু রংয়ের ইউনিফর্ম) সজ্জিত হচ্ছেন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শিগগিরই এই পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। স্মার্ট ইউনিফর্ম একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পোশাকের সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়েছে র‍্যাংক ব্যাজও। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬৮-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পোশাক বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন করেছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, প্রসিকিউটর, পরিদর্শক, উপ-পরিদর্শক, সহকারী উপপরিদর্শক, সিপাহী, ওয়্যারলেস অপারেটর ও গাড়িচালক প্রত্যেকেই এই ইউনিফর্ম ব্যবহার করবেন।

১৩। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত মহাপরিচালক পর্যায়ে ৭ টি ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ ব্যাপারে বেশ সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা রেখে এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি

মাদকদ্রব্য বিরোধী সরকারি/বেসরকারি যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও মাদক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটির কার্যক্রম জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের নেতৃত্বে জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটি, জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি রয়েছে।

১৫। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ২য় সভা গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১, তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো:

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে ''জিরো টলারেন্স" নীতি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে কোন পর্যায় পর্যন্ত কোন ধরনের অস্ত্র দেয়া যায়, অস্ত্রের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

(গ)) মাদকবিরোধী সময়োপযোগী টিভিসিগুলো গণযোগাযোগ অধিদপ্তরসহ বেসরকারী টিভি চ্যানেল, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে মাদকবিরোধী মিডিয়া ক্যাম্পেইন করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি (TOR) অনুযায়ী প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা দ্রুত ও নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে পাঠ্য পুস্তকে মাদকের কুফল সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে খসড়া সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনাটি আলোচেনা/পর্যালাচেনা করে চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়নে চলতি অর্থবছরে থোক বরাদ্দ ও কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটিস (সিএসআর) এর মাধ্যমে এবং পরবর্তী অর্থবছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেট ও কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটিস (সিএসআর) এর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(চ) সরকারি/ আধা সরকারি/ বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার চিঠির খামে ও চিঠিতে মাদককে না বলুন স্লোগান মুদ্রিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করবে। ভ্রাম্যমান যানবাহনের মাধ্যমে জাতীয় দিবস/বিশেষ দিবসসমূহে মাদকবিরোধী প্রচারণা করতে হবে;

(ছ) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র মনিটরিং এর জন্য গঠিত জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কমিটিসহ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যে সকল বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র মানসম্মত নয় তা বন্ধ করে দিতে হবে।

(জ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে একটি আন্তর্জাতিক মানের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমাদেনের জন্য দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ)"ডোপ টেস্ট বিধিমালা-২০২১" চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে। নতুন চাকরিতে নিয়োগকালে এবং গাড়িচালকদের আবশ্যিকভাবে ডোপ টেস্ট করাতে হবে। চাকরিজীবী এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় পরিলক্ষিত হলে বিধি অনুযায়ী ডোপ টেস্ট করাতে হবে ।

(ঞ) রেশনের প্রাধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থার ন্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে গ্রেড-১ পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের রেশন প্রদানের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

(ট) জব্দ ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল ধরনের মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বিধি মোতাবেক ধ্বংস করতে হবে।

(ঠ) মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে পারস্পারিক যোগাযোগ এবং দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকসহ প্রচলিত ডিসি-ডিএম সভা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৬। সমন্বয় সভা

অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতি তিন মাস পর পর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রধান কার্যালয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে দেশি মদ, দেশে তৈরি বিলাতি মদ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, রেক্টিফাইড স্পিরিট ও বিভিন্ন লাইসেন্স/পারমিট ফি থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তর বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৭০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে। অধিদপ্তরের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ এবং অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	ব্যয়ের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ	আদায়কৃত মাদকশুল্ক (রাজস্ব আয়) (হাজার)
২০১১-২০১২	২৪,১৭,৮৫,০০০ টাকা	৬৬,০৪,৮৬,৫২২ টাকা
২০১২-২০১৩	৩০,০৩,০০,০০০ টাকা	৭১,২৩,২৯,৯৮৭ টাকা
২০১৩-২০১৪	৩৫,৩৮,৮৫,০০০ টাকা	৬৮,৫৬,৯৯,৯২১ টাকা
২০১৪-২০১৫	৪৫,০০,০০,০০০ টাকা	৭০,২২,২৫,২১০ টাকা
২০১৫-২০১৬	৬৭,২০,৭৬,০০০ টাকা	৬৮,৫৭,৯৩,৭৬৬ টাকা
২০১৬-২০১৭	৮৫,০২,৯৮,০০০ টাকা	৬৭,৪৩,৯৫,৯২৫ টাকা
২০১৭-২০১৮	১০৫,৪০,৭০,০০০ টাকা	৭৯,৬৫,০০,০০০ টাকা
২০১৮-২০১৯	১,৩৩,১৪,৩৯,০০০ টাকা	৭৬,৭৭,৮২,১৪২ টাকা
২০১৯-২০২০	১,৭২,৫০,০০,০০০ টাকা	৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯ টাকা
২০২০-২০২১	৭৮,৭৪,৬৬,৬৩৯ টাকা	১৯৫,১৪,৯১,০০০ টাকা
২০২১-২০২২ (এপ্রিল)	৭৫,৩৮,৮২,৮৯৪ টাকা	২১০,৬১,১৯,০০০ টাকা

১৮। সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ

করোনাকালীন সময়ে অন-লাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০০৯ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, মে, ২০২২ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩,১১৮জন কর্মকর্তা, ১৩৩ জন কর্মচারীসহ ৮,২৫১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে অধিদপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন প্রতি ৫০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো হলো:

ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স

খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স

গ) অপরাধ দমন, তদন্ত ও তল্লাশির সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং

ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ।

১৯। অন্যান্য পদক্ষেপ

লোকেবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জনবল ১৭১৩ হতে ৩০৫৯ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুমোদিত জনবল নিয়োগ হলে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। এছাড়া, ১০ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন প্রদান করা হয়েছে। নতুন ৪৯টি গাড়ি অনুমোদনসহ বর্তমানে অধিদপ্তরে ১০২টি গাড়ি রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের ৩৩৪৫ লক্ষ টাকার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে, যা ১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জানুয়ারি, ২০০৯ সাল থেকে মে, ২০২২ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য লজিস্টিক সামগ্রীর মধ্যে রিপিটার ৭৪টি, ওয়াকিটকি ৩৮৮টি, কার মোবাইল ৩৫টি, টাওয়ার ৪টি, যানবাহন ৫০টি, মোটর সাইকেল ১টি, কম্পিউটার ১৬২টি ও ৪০টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত করা হয়েছে, যাঁরা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মধ্যেমে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন।

বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে The Korea International Cooperation Agency (KOICA)-- এর সহায়তায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM it)' শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় এসেছে।

২০। দ্রুত সেবায় হটলাইন

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের গোপন তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হটলাইন চালু করা হয়। ০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮, এই নম্বরে ফোন করে অবৈধ মাদক চোরাচালান সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য প্রদান করা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই একটি নাম্বারে ফোন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যেকোনো জেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে ।

২১। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাজে গুণগত ও পরিমাণগত দৃশ্যমান পরিবর্তনের জন্য এবং অধিদপ্তরকে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট ও কক্সবাজারে ওয়ারলেছ টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৮৮ টি ওয়াকিটকি, ৭৪ রিপিটার ক্রয় করা হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে মাদকবিরোধী মিডিয়া ক্যাম্পেইন করতে হবে।

২২। আইনি সংস্কার

২০০৯ সাল হতে মে, ২০২২ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০২১। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১। অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২, যাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ও পারমিট ফিস) বিধিমালাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২২ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮(সংশোধিত-২০২০) সময়োপযোগী করে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

২৩। অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন

মে, ২০২১-২০২২ পর্যন্ত অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠিত হয়েছে। যার তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	শ্রেণি	বিদ্যমান মঞ্জুরীকৃত জনবল	কর্মরত জনবল	শুন্য
১	প্রথম শ্রেণি	৩০৮	১১৭	১৯১
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	২৯৭	১৬৩	১৩৪
৩	তৃতীয় শ্রেণি	২১৪৫	১৪৩৯	৭০৬
৪	চতুর্থ শ্রেণি	৩০৯	১০০	২০৯

অফিস সেট আপ

অফিসের নাম	পূর্বের সাংগঠনিক কাঠামোতে অফিস	পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অফিস	মন্তব্য
উপ-আঞ্চলিক/ জেলা অফিস	২৩টি জেলা	৬৪টি জেলা	৪১টি জেলায় নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে
মেট্রো অফিস	০২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)	০৪টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) (উত্তর ও দক্ষিণ)	
বিভাগীয় অফিস	০৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)	০৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)	
বিভাগীয় গোয়েন্দা অঞ্চল	০৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)	০৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)	
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	০১টি	০১টি	
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	০১টি (৪০ বেড বিশিষ্ট)	০১টি (১০০ বেড বিশিষ্ট)	
মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র	০০	০১টি (১৫০ বেড বিশিষ্ট)	
আঞ্চলিক নিরাময় কেন্দ্র	০৫টি	২৫টি	
সমুদ্র বন্দর	০০	০৩টি	
স্থল বন্দর	০০	০৮টি	
বিমান বন্দর	০১টি	০৪টি	

২৪। মাদক নির্মূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮(সংশোধিত-২০২০) এর সাথে সঙ্গতি রেখে ডোপ টেস্ট বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- মাদকবিরোধী সরকারি/ বেসরকারি যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি রয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য উপদেষ্টা কমিটি', মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি', জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি রয়েছে।
- এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়াগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচার বিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি প্রয়োজন অনুসারে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য সহকারী পরিচালক এর নেতৃত্বে একটি টীম কাজ করছে। মূলত: নৌপথে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ি ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে "টেকনাফ বিশেষ জোন" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেকনাফ এলাকায় মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ১টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও UNODC কর্তৃক প্রদত্ত দু'টি স্পিডবোট নাফ নদীতে সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮(সংশোধিত-২০২০) সময়োপযোগী করে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর,২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে মোট মঞ্জুরীকৃত পদ ৩০৫৯টি। বর্তমানে কর্মরত আছে ১৮১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। ১২৪০টি শূন্যপদের বিপরীতে প্রায় ১৮৬ জনের নিয়াগে প্রক্রিয়া ২০২২ এর মধ্যে শেষ হবে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বহুল প্রতীক্ষিত রেশন (১০ম গ্রেড হতে তদনিম্ন পর্যায়) ও তদন্ত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশ্বমানের ইন্টারোগেশন ইউনিট স্থাপন, ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, উন্নত গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপন, মাদক শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নৌ-ইউনিট ও সাইবার ইউনিট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড ইউনিট স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন ল্যাব স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অপরাধ দমন কাজে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়ন করা হয়েছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা কাজ করছেন।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮(সংশোধিত-২০২০) এর সাথে সঙ্গতি রেখে ডোপটেস্ট বিধিমালা; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা; আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- নিয়োগ বিধিমালা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

- ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

- দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ২০ একর জমির নির্বাচন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে The Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর সহায়তায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM) it)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২৫। মাদক অপরাধ দমনে যানবাহন সরবরাহ

অধিদপ্তরের মাদক অপরাধ দমন কাজে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন প্রতিষ্ঠিত সকল জেলা কার্যালয়ে যানবাহন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিটি সার্কেলে একটি করে ডাবল কেবিন পিকআপ ও মটর সাইকেল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়াজেন। তবে অধিদপ্তরের টিওএন্ডইতে ১০২টি যানবাহন রয়েছে এবং ১০১টি যানবাহন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। অনুমোদিত হলে যথারীতি যানবাহন ক্রয় করা যাবে।

২৬। চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

- বাজেট বরাদ্দ : কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মাদক আগ্রাসন ঠেকাতে আগের থেকেবরাদ্দ বাড়ানো হলেও বিপুল জনসংখ্যার বাস্তবতায় আরও বাজেট বরাদ্দ প্রয়াজেন। বিশেষ করে মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অধিক কর্মসূচি পালনের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

- জনবল : অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাব রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৩০৫৯ জন থাকলেও বর্তমানে কর্মরত ১,৮১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। দেশে মাদকের ব্যাপকতা ও প্রাদুর্ভাবের তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল খুবই অপ্রতুল। প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশে মাদক অপরোধর মতো মারাত্মক অপরাধ মোকাবিলায় অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতা একটি বড় চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। প্রতি ২,০০,০০০ জনের বিপরীতে মাত্র ১ জন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী নিয়োজিত। এত স্বল্প জনবল নিয়ে মাদকের মতো ভয়ঙ্কর বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলা করা কঠিন।

- দক্ষতা : মাদক অপরাধ দমনে বিশেষ তাত্ত্বিক, পেশা ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-দক্ষতা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাত্ত্বিক, পেশা ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান ও দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। অধিদপ্তরের জনবলকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

- সমন্বয় : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আন্তঃবাহিনী ও সংস্থার সমন্বয় নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয় জড়িত। এদের মধ্যেসুসমন্বয় প্রয়োজন।

- নতুন মাদক : প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটছে। সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস (ইয়াবা, কিটামিন, ক্রিষ্টাল আইস, এলএসডি)-এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক ঠেকাতে এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা হয়েমাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধের কৌশল নিয়েও কাজ করছে।

- ইয়াবার আগ্রাসন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ তথা দেশবাসীর জন্য বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইয়াবা নামক মাদকটির প্রসার রোধ করা। এর বিস্তার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ঘটেছে। ইয়াবা বহন করা সহজসাধ্য বিধায় এর বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইয়াবার প্রসার ঘটেছে। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও ইয়াবায় আসক্ত হচ্ছে এবং ইয়াবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

- ঝুঁকি : অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরস্ত্র অবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ ও সশস্ত্র মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করেন । জীবনের ঝুঁকি নিতে তারা দ্বিধাবোধ করেন না।
- কালো টাকা : মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কালো টাকার প্রভাবে সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
- লজিস্টিক : ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, অপরাধীদের ব্যবহৃত মোবাইল ট্রাকিং এবং অপরাধ দমন কাজে যানবাহনের অভাব।
- সীমান্ত : প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সীমান্তপথে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ করতে না পারা।

২৭। মাদক সমস্যা সমাধানে করণীয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকে মাদকমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নানা সমস্যার মধ্যেও এ প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেক। সব লক্ষ্য পূরণ বা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উত্তরণ হয়েছে এমন দাবি করা যুক্তিসংগত হবে না । কিন্তু এই বাস্তবতাও মানতে হবে যে, মাদক নিয়ে সংকট একদিনে তৈরি হয়নি, কিংবা এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের সমস্যাও নয়। বিশ্বজুড়েই মাদককে এখন ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে দেখা হচেছ। ভয়ঙ্কর এই বিপদ রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না। একে সমূলে উৎপাটন করাও সহজ নয়। তবে বাস্তবভিত্তিক ও কৌশলী পদক্ষেপে মাদক সমস্যা নিরসনে দ্রুত সাফল্য আসতে পারে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ :

১.বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান : মাদক আগ্রাসন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের মতো উন্নত দেশগুলোর আদলে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে। সারকথা হলো, এ অধিদপ্তরকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে ।

২. স্ট্রাইকিং ফোর্স : অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীয় শহর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহে র‍্যাব-এর মতো স্ট্রাইকিং ফোর্স সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ : জনসচেতনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়াজেনে এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. মিডিয়ার ভূমিকা : ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত করা।

৫. জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র : মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৬. সীমান্ত ও সেফটি নেটওয়ার্ক : সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারে জড়িত অতি দরিদ্রদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেফটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

৭. ঝুঁকি কমানো ও ভাতা প্রদান : অভিযানে নিরস্ত্র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলার ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন ও ঝুঁকিভাতা প্রবর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য বর্তমানে ১০ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী রেশন প্রাপ্তির আওতাভুক্ত হয়েছে। যা, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উদ্দিপনা সৃষ্টি করেছে।

৮. একাডেমিক শিক্ষা : একাডেমিক শিক্ষায় মাদকের বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণসহ পাঠ্য বইয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে মাদকের উপর বিষয় সংযোজেন করতে হবে।

৯. সাইবার ইউনিট প্রতিষ্ঠা: আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মাদক অপরাধীদের মোকাবিলার জন্য সাইবার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

শেষ কথা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে এ দেশের সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। মাদকের অপব্যবহার ক্রমবৃদ্ধির কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তরুণ সমাজের একটি অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ায় তারা জড়িয়ে পড়েছে নানাবিধ অসামাজিক কর্মকান্ডে, বিনষ্ট হচ্ছে তাদের মেধাশক্তি। মাদকের করাল গ্রাস হতে তরুণদের বাচাঁতে হলে মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি কমাতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দিনরাত নিয়োজিত থাকছেন। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়াটাই তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জিং। শুধু আইনের প্রয়োগ করে কোনো একক সংস্থার পক্ষে এ জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সবার আন্তরিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। আসুন সকল মিলে পরিবার হতে শুরু করে সকল স্তরে মাদকের বিরুদ্ধে সমবেত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি। তাহলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুন্য সহিষ্ণুতা ঘোষণার ভিত্তিতে মাদকমুক্ত দেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক।

মাদক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা: একটি মাইলস্টোন

মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ

পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

শুরু হয়ে গেছে মাদকের বিরুদ্ধে এক ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক আন্দোলন যা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprhensive Action Plan) হিসেবে পরিচিত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল মহোদয়ের ব্রেইন চাইল্ড হলো এ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদক বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাতে সমাজ হতে ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য নির্মূল করা এবং অন্যান্য মাদক যা শিল্প কারখানায় ও উৎপাদন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলির অপব্যবহার রোধ করা। এ জন্য প্রথমে একটি প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক তা সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে তা অনুমোদন লাভ করে মাঠ পর্যায়ে এর দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ কর্ম পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য তিনটি দিক হলো:

(১) প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

(২) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন

(৩) সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কাজের তদারকি

(১) প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ:

বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠান:

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালায় বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহের সকল জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ আনসার, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্টগার্ড ও বিভাগীয় পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা/সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সাংবাদিক, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্মী, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দেশের আটটি বিভাগে ইতোমধ্যে আটটি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ উপস্থিত থেকে মাদক নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম ঢাকা বিভাগের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৮/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান খান এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ , জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডের পদস্থ কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মশালায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রেজেনটেশন করেন।

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহ গ্রুপ ভিত্তিক স্ব স্ব জেলার মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আলোচনা ও খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। অতঃপর জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর ও মাদারিপুর তাদের জেলার মাদক ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে খসড়া কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বক্তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মাদক ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণের অভিপ্রায় নিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মশালা গত ১৩/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব সাইফুজ্জামান, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় আনসার, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডের পদস্থ কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মশালায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ গ্রুপ ভিত্তিক স্ব স্ব জেলার মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আলোচনা ও খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। অতঃপর সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ তাদের জেলার ক্ষতিকর মাদক নির্মূল ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে খসড়া কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বক্তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মাদক ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ নিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

সিলেট বিভাগের কর্মশালা গত ১৫/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব সাইফুজ্জামান, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় আনসার, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডের পদস্থ কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মশালায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ গ্রুপ ভিত্তিক স্ব স্ব জেলার মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আলোচনা ও খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। অতঃপর সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ তাদের জেলার ক্ষতিকর মাদক নির্মূল ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে খসড়া কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বক্তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মাদক ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ নিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠান:

বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা সমাপ্ত হবার পর জেলা পর্যায়ে কর্মশালা শুরু হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্যান্য জেলায় ১৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে। জেলা পর্যায়ে কর্মশালায় জেলার আওতাধীন উপজেলা হতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সহকারী কমিশনার(ভূমি), পৌরসভার মেয়র, থানার ওসি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্মীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত

থাকছেন। প্রতিটি উপজেলা গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা করে স্ব স্ব উপজেলার ক্ষতিকর মাদক নির্মূল ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও উপস্থাপন করেন। জেলা পর্যায়ের কর্মশালায় অংশ নিয়ে উপজেলাসমূহ প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজ উপজেলার স্ট্যান্ডার্ড কর্মসূচি প্রণয়ন করে কাজ করবে।

উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা:

জেলা পর্যায়ের কর্মশালা সম্পন্ন হবার পর উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৭টি বা সকল উপজেলায় এ কর্মশালা আগামী ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালার পরিধি ও ক্ষেত্র হবে অনেক বড়। এখানে সরকারি কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, বিভিন্ন যুব সমিতি, এনজিও ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে কর্মশালা সম্পন্ন করতে হবে। মূলতঃ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল ফোকাস হবে উপজেলা ও এর আওতাধীন ইউনিয়নসমূহ। এ কারণে উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালাটি বেশ গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করে ইউনিয়নের বার্ষিক মাদক বিরোধী অ্যাকশন প্লান তৈরি করতে হবে।

(২) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন:

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার প্রথম ধাপ হলো প্রস্তুতিমূলক যা ইতোমধ্যে বিধৃত হয়েছে। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে এ প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হবে। মূলতঃ ৩০ জুন,২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে এ প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপ হলো বাস্তবায়ন, যা ১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্ড, গ্রাম, পাড়া, মহল্লা, ক্লাব, সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বস্তি, হাট-বাজার, রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, টেম্পো বা সিএনজি স্ট্যান্ড, জনসমাগম স্থান, মসজিদ, মন্দির, হরিজন সম্প্রদায়ের এলাকা, জেলে পল্লী, বেদে পল্লীসহ মাদক-প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন কাজ করবে।

ওয়ার্ড, ইউনিয়ন বা উপজেলায় ক্ষতিকর মাদক নির্মূল ও মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বা কর্মসূচি হবে ইনোভেটিভ। এখানে গতানুগতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না। এমন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না যা ঐ এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে মাদক বিরোধী সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়। মূলতঃ যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করলে সাধারণ জনগণের মধ্যে বেশি সাড়া পড়বে, মানুষজন সচেতন হবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে, সে সব কর্মসূচি বেশি বেশি গ্রহণ করতে হবে।

কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে সেক্টর ভিত্তিক পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশি বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ এ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা মাদকে আসক্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম এমন হতে হবে যা তাদের মন, মানসিকতা, বিবেক ও চিন্তাধারাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। মাদকের কুফল ও ক্ষতিকর দিকসমূহ তাদেরকে বুঝাতে হবে যাতে তারা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাদক হতে দূরে থাকে। এজন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করানো, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, অভিভাবক সমাবেশ ও আলোচনাসহ নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মননে ও চিন্তা চেতনায় মাদকের কুফল এবং ক্ষতিকর প্রভাব জাগ্রত করা গেলে আগামী প্রজন্ম একটি মাদক-মুক্ত সমাজে শান্তিতে বিচরণ করার সুযোগ পাবে।

সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কাজের তদারকি

১ জুলাই, ২০২২ হতে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে বা মাঠপর্যায়ে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড বা গ্রাম, পাড়া মহল্লায় যেসব কর্মসূচি গৃহীত হবে তা সফটওয়্যারে আগে আপলোড করতে হবে। এতে কোথায়, কখন কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যাবে। কোনো কারণে কোথাও কোনো কর্মসূচি বাতিল, পরিবর্তন বা স্থগিত হলে তাও জানা যাবে। একইভাবে সারাদেশে কোথায় কি ধরনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে বা চলমান রয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে তাও জানা যাবে। ফলে মাদকের বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে পরিচালিত ও তদারকি হবে যা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব।

আসুন, সবাই মিলে মাদককে না বলি। মাদকের অপব্যবহার দেশ ও জাতির চরম ক্ষতি করে। দেশকে মাদকের ছোবল হতে রক্ষা করতে হবে, যুব সমাজকে মাদকের প্রভাব হতে রক্ষা করতে হবে এবং আগামীর সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা একটি মাইলফলক হিসেবে প্রতিভাত হোক– এ প্রত্যাশা আমার আপনার সবার।

বাংলাদেশে মাদক গোয়েন্দা কার্যক্রমের ইতিহাস ও পটভূমি

মোহাম্মদ আবু তালেব

প্রাক্তন পরিচালক,
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
এবং ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ইউএনওডিসি

রাষ্ট্র এবং যেকোনো সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় গোয়েন্দাবৃত্তির ইতিহাস বহু পুরোনো। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্রাচীন চীনের সমরবিদ ও দার্শনিক Sun Tzu তাঁর বিখ্যাত Art of war গ্রন্থে লিখেছেন, "One who knows the enemy and knows himself will not be endangered in a hundred engagements". আমাদের এ উপমহাদেশে ঋগ্‌বেদ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রণয়নের সময়কাল থেকেই রাজত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রতিপক্ষের উপর গোয়েন্দা কার্যক্রম চলে আসছে। কৌটিল্যের মতো চাণক্যও (অনেকের মতে উভয়েই ছিলেন একই ব্যক্তি) গোয়েন্দা কার্যক্রমের উপর বহু দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা। প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি প্রবাদই ছিল "Spies are king's eyes", অর্থাৎ গোয়েন্দারা আসলে রাজশক্তির চোখ।

অশোক থেকে শুরু করে মোঘল আমল পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের হাজার হাজার মাইল দূরের ক্ষুদ্র নৃপতি, সেনাধ্যক্ষ ও সামন্তদের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির জন্য তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা ছিল অতি জরুরি– আর এ কাজটা করতো সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত গুপ্তচরেরা। চাণক্যের নীতিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা কাজের চারটি নীতি ছিল যথা: সাম (মধ্যস্থতা), দাম (কোনো উপঢৌকন বা ঘুস দেয়া), দন্ড (শাস্তি), এবং ভেদ (বিভাজন)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গোয়েন্দা কাজের জন্য যেসব ব্যক্তি, পেশা ও পরিচয়ের ছদ্মবেশ ধারণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো:
আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, তপস্বী ও সাধু-সন্ন্যাসী, পর্যটক, চারণ কবি, ভাঁড় ও বিদূষক, রহস্যময় ব্যক্তি, জ্যোতিষী, ভবিষ্যতবক্তা, গণক, চিকিৎসক, পাগল, বোবা, কালা, প্রতিবন্ধি, অন্ধ, বণিক, চিত্রকর, কাঠমিস্ত্রি , গায়ক, বাদক, নতর্কী বা নর্তক, শুড়ি বা মদ বিক্রেতা, রুটিওয়ালা, বাবুর্চি, মাংস বিক্রেতা ইত্যাদি। বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চলমান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বৃটিশরাজ এদেশে তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়েছে।

১৮৫৭ সালে অখন্ড ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণের পর বৃটিশ সরকার যেসব স্থানীয় উৎস থেকে রাজস্ব আহরণে মনোনিবেশ করে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল আফিম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোম্পানির কর্মচারীরা আফিম চাষের ক্ষেত্রে নানান অনিয়ম ও দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। কোম্পানি আমলে আফিম বা অন্যান্য মাদক থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য এখনকার মতো কোনো আইন না থাকলেও কোম্পানির জারি করা ফরমানে আফিম চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আফিম চাষের কিছু নীতিমালা থাকলেও বাস্তবে এর প্রতিপালনের পরিবর্তে চাষীদের উপর কোম্পানির কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থ-লালসা ও সীমাহীন দুর্নীতি ছিল ।

কোম্পানি চাষীদের দিয়ে জোর করে আফিম চাষ করোলও আফিমের ন্যায্য দাম কখনও দিত না। তারপরেও যেটুকু দাম বরাদ্দ ছিল, তার অনেকখানি অর্থলোলুপ কোম্পানি কর্মচারীরা চাষীদের না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করতো। ফলে চাষীরাও কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে আফিম চাষ না করা, কিংবা চাষ করলেও উৎপাদিত আফিম কোম্পানিকে না দিয়ে গোপনে

কালোবাজারে বিক্রি করে দেওয়ার নানা রকম ফন্দি ফিকির বের করতো। সুতরাং আফিম চাষীরা প্রতিশ্রুত পরিমাণ জমিতে আফিম চাষ করছে কিনা, কিংবা চাষ করলেও উৎপাদিত আফিম চুরি করে কালোবাজারে পাচার করছে কিনা, কোম্পানির পক্ষ থেকে কোম্পানির কর্মচারীরা এর উপর গোপন নজরদারি করতো।

১৭৬৪ সালে এদেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাসম্বলিত দিওয়ানী লাভের পর ভারতীয় চাষীদের দিয়ে জোর করে আফিম চাষের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের শুরু থেকেই চাষীদের আফিম চাষ না করা, কিংবা চাষকৃত ও উৎপাদিত আফিম কোম্পানিকে না দিয়ে গোপনে কলোবাজারে বিক্রি করে দেওয়ার উপর কোম্পানির কর্মচারীদের নজরদারির এই প্রক্রিয়াকে বলা যায় এদেশে মাদকের উপর গোয়েন্দাগিরির আদি প্রয়াস। ১৭৬৪ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী ভারতীয় চাষীদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দৌরাত্ম যেমন চরম আকার ধারণ করেছিল, তেমনি নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে হতে ভারতীয় আফিম চাষীরাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা রকম চুরি, ফাঁকিবাজি ও প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৭ সালে বৃটিশরাজ এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কোম্পানির কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারী হিসেবে থেকে যায়, সাথে সাথে থেকে যায় তাদের দুর্নীতি ও পুকুর চুরির অভ্যাসও। আফিম চাষীরাও কোম্পানির কবল থেকে বৃটিশ সরকারের কবলে এসে খুব যে লাভবান হয়েছিল তা নয়। বরং অর্থগৃধু বৃটিশ সরকার এদেশের চাষীদের উপর তাদের শোষণের হাতকে আরো সম্প্রসারিত করে।

১৮৫৭ সালে প্রণীত আফিম আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের আফিম চাষ ও আফিম ব্যবসা থেকে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে যত রকম ফাঁকি এবং ফাঁক ফোকর ছিল সেগুলো বন্ধ করা। এর জন্য আইনের যত বিধান ছিল তার সবই আফিম চাষে চাষীদের লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্য বাধকতা, চুক্তি মোতাবেক আফিম চাষ না করলে, বা সমুদয় আফিম সরকারকে সমর্পণ না করলে শাস্তির বিধান, আফিমের চুরি বা পাচার প্রতিরোধ, আফিমের অবৈধ ক্রয় বিক্রয় প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য আফিম কর্মচারীদের উপর পুরোপুরি ভরসা না থাকায় বৃটিশ সরকার পৃথকভাবে একটি গোয়েন্দা শাখা সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এর নাম হয় Excise Intelligence Bureau বা (EIB). Excise Intelligence Bureau সরকারের নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয়ক গোয়েন্দা শাখাগুলোর মতোই তাদর গোয়েন্দা কার্য পরিচালনা করতো। তবে এদের অধিক্ষেত্র ছিল শুধু আফিম চাষ, আফিম উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়, রাজস্ব ফাঁকি এবং আফিমের চুরি বা পাচার বিষয়ক নানান অপরোধর তথ্য সংগ্রহ।

১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্ম পরিধি আফিম থেকে সম্প্রসারিত হয়ে মদ এবং গাঁজার উপরও বিস্তৃত হয়। অবিভক্ত বাংলায় এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্তমানে তেমন কোনো পরিসংখ্যান বা তথ্য পাওয়া যায় না। অবিভক্ত বাংলার ১৯২৯-৩০ সালের এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপার্টে থেকে দেখা যায় সে সময়ে Excise Intelligence Bureau-তে মাঠ পর্যায়ে ৩ জন পরিদর্শক, ৫ জন উপ-পরিদর্শক, ২৪ জন পেটি অফিসার, এবং ৫৯ জন পিওন কাজ করতেন। এরা Deputy Commissioner of Excise (Preventive) এর অধীনে কাজ করতেন। এ সময় এরা যেসব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতেন তার ভিত্তিতে মাদক অপরাধী-দের ছবিসহ নিয়মিত "Criminal Intelligence Gazette" প্রকাশ করা হতো। ১৯১৮ সালে ছাপা হওয়া Excise Manual Vo. II এর ৩৫৫ থেকে ৩৬৭ অনুচ্ছেদে Excise Intelligence Bureau সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বাংলাসহ অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মাদকদ্রব্যের সংঘবদ্ধ চোরাচালান প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশের সাথে সমঝোতা ও যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে এ ব্যুরো কাজ করতো।

এদের দায়িত্ব ছিল দেশের মধ্যে এক্সাইজ, আফিম এবং সল্ট-এর ক্ষেত্রে যত রকম চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হতো তার গোপন তথ্য সংগ্রহ, এগুলোর যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সমস্ত জেলা মাদক অফিসের কাছে তা সরবরাহ করা। স্থানীয়ভাবে যেসব মাদক অপরাধ সংঘটিত হতো, এর তদন্ত কাজে গোপন তথ্য ও পরামর্শ দিয়েও এ ব্যুরো সহায়তা করতো।

বাংলা প্রদেশের এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকেও অপরাধের তথ্য দিয়ে অপরাধ দমন ও তদন্তে সহায়তা করতো। মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট তাদের অপরাধ দমন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যও এ ব্যুরোকে সরবরাহ করতো। তবে অতি নগণ্য পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনা এ ব্যুরোকে জানানোর ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মাদক অপরাধীরা বিচারাধীন বা জেলখানায় থাকা অবস্থায় মাদক অপরাধে গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের বিস্তারিত পরিচিতি এবং বাসস্থানের তথ্যও এ ব্যুরো যাচাই করতো। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অপরাধীদের বাসস্থান যে জেলায় সেখানকার কালেক্টরের সাহায্য গ্রহণ করা হতো। মাদক অপরাধে কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে সে তথ্য এ ব্যুরোকে জানানো হতো। মাদক অপরাধে কারো অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং এর জন্য উক্ত ব্যক্তি কোনো মেয়াদের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত হলে এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সাব-ইন্সপেক্টর বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জেলখানায় গিয়ে উক্ত দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার মাদক প্রাপ্তির উৎস, তার অপরাধের সহযোগীবৃন্দ, তার অর্থের যোগানদাতা, তার অপরাধ কর্মের নিয়োগদাতা, তার অপরাধ করার কলা কৌশল, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যুরোকে সরবরাহ করতো।

বাংলা প্রদেশের কোনো মাদক পাচারকারী ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে ধরা পড়ে দন্ডপ্রাপ্ত হলে তার দন্ড শেষ হবার কমপক্ষে ২ মাস আগে তাকে তার নিজ জেলার কারাগারে স্থানান্তর করা হতো এবং তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোকে জানানো হতো এবং ব্যুরো সে তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে জানাতেন। কালেক্টর উক্ত তথ্য পেয়ে অবিলম্বে একজন এক্সাইজ কর্মকর্তাকে পাঠাতেন উক্ত অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার অপরাধের ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করতে। সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে এটা ব্যুরোর কাছে পাঠানো হতো। মাদক অপরাধের যেকোনো মামলার ক্ষেত্রে উক্ত মামলার একটা History Sheet নির্ধারিত ফরমে এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কাছে পাঠানো হতো। মাদক অপরাধে যেখানেই কোনো ব্যক্তি ধরা পড়তো, উক্ত ব্যক্তির ফটোগ্রাফসহ তার বিস্তারিত পরিচয়, শনাক্তকরণ চিহ্ন এবং দৈহিক বর্ণনাসম্বলিত একটি প্রতিবেদনও এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কাছে পাঠাতে হতো। একজন দন্ডপ্রাপ্ত মাদক অপরাধী জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তার গতিবিধি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করা হতো। এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে নিয়মিতভাবে নিম্নবর্ণিত প্রকাশনা বের হতো এবং তা প্রত্যেক জেলার মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত অফিসে সরবরাহ করা হতো:

(১) মাদকদ্রব্যের চোরাচালান বিষয়ক স্মারকলিপি।

(২) মাদক চোরাকারবারীদের তালিকা, যেখানে বাংলা প্রদেশ এবং বাংলার বাইরে বসবাসকারী কিন্তু বাংলায় মাদকের চোরাকারবার করে এমন ব্যক্তিদের তালিকা থাকতো।

(৩) মাদকপ্রবণ গ্রাম ও এলাকার তালিকা, যেখানে মাদক অপরাধের প্রকৃতি এবং এর সাথে জড়িত বা এর পৃষ্ঠপোষকদের বিবরণী থাকতো।

(৪) "Criminal Intelligence Gazette" নামক সাপ্তাহিক প্রকাশনা, যেখানে মাদকের অপরাধ ও মামলা, মাদক মামলার

History Sheet, মাদক অপরাধীদের ছবি ও তাদের জবানবন্দী, বিভিন্ন প্রদেশে মাদকের পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য , মাদক রাজস্বের হার, বিভিন্ন আদালতের রায় ও সিদ্ধান্ত (ruling) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা এতে থাকতো। Excise Intelligence Bureau থেকে মাদক চোরাকারবারীদের তালিকা ও বিবরণী প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ও গোয়েন্দারা যাতে এসব মাদক চোরাকারবারীদের সম্পর্কে জানতে পারে; এবং তারা এক জেলা বা প্রদেশ থেকে অন্য জেলা বা প্রদেশে, কিংবা জেলা বা প্রদেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে কি করে মাদকের চোরাকারবার করে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধারণা দেওয়া। কোনো এলাকায় কোনো মাদক চোরাকারবারীর আবাস থাকলে ঐ এলাকার মাদক কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল তার গতিবিধির উপর নজর রাখা এবং তাকে বাস্তবে ভালোভাবে চিনে নেয়া।

কোনো মাদক চোরাকারবারী কোনো কারণে তার এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে, কেন চলে গিয়েছে তার খোঁজ নিয়ে এ ব্যাপারে ব্যুরোকে জানানো বাধ্যতামূলক ছিল। এরূপ চোরাকারবারী কোথায় গিয়েছে জানা গেলে অবিলম্বে তা ব্যুরোকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে অবহিত করতে হতো যাতে সেখানে তার কার্যকলাপ ও গতিবিধির উপর নজরদারি করা যায়।

কোথাও কোনো মাদক চোরাকারবারীর সন্ধান পাওয়া গেলে এবং তার বিবরণী যদি চোরাকারবারীর তালিকায় না থাকে, তবে অবিলম্বে তা ব্যুরোকে জানাতে হতো যাতে তার নাম পরবর্তী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কোনো মাদক চোরাকারবারী মারা গেলে এব্যাপারে সত্যতা নিরূপণ করে ব্যুরোকে জানানোর বিধান ছিল। কোনো মাদক কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনসূত্রে কোথাও যদি এমন কোনো সংবাদ, তথ্য, ক্লু বা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন, যার সাথে কোনো না কোনোভাবে কোনো মাদক অপরাধের যোগসূত্র থাকতে পারে, তাহলে তাও অবিলম্বে ব্যুরোকে জানোত হতো।

Excise Intelligence Bureau-এর প্রধান কার্যালয়ে একটি মাদক ও মাদক অপরাধ বিষয়ক সংগ্রহশালা ছিল, যা যেকোনো মাদক কর্মকর্তার দেখার জন্য উন্মুক্ত ছিল। মাদক অপরাধ বিষয়ক যেকোনো পরামর্শ দরকার হলে, কিংবা কোনো ব্যক্তির নামে কোনো মাদক লাইসেন্স ইস্যু করার সময় ঐ ব্যক্তি কোনো মাদক অপরাধে জড়িত কিনা-এ ব্যাপারে জানার জন্য এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে তথ্য নেওয়া হতো। বৃটিশ আমলে এখনকার মতো কোনো তথ্য প্রযুক্তি, কিংবা তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা তথ্য ভান্ডার না থাকলেও এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো মাদক বিষয়ক গোয়েন্দা কার্যক্রমের পাশাপাশি মাদক বিষয়ক যেকোনো অপরাধ বা অপরাধীর তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করতো।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বদেশীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট দুই ভাগ হয়ে পূর্ব বাংলার অংশ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক এক্সাইজ নামে পুনর্গঠিত হয়। এখানে নতুন করে এক্সাইজ কমিশনার এবং ডেপুটি এক্সাইজ কমিশনার নিয়োজিত হন। এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো পূর্ববত ডেপুটি এক্সাইজ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত হয়। এ সময় এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে মাত্র ২ জন ইন্সপেক্টর, ৮ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১০ জন পেটি অফিসার এবং ৪০ জন পিওন ছিল।

তখনকার দিনে এখনকার মতো এতো রাস্তাঘাট ছিল না। সড়ক পথে যানবাহনের চলাচল ছিল খুবই সীমিত। বিশেষ করে দূর পালায় বাস, ট্রাক, লরি, কাভার্ড ভ্যান, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস এসব ছিলই না। দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের এবং পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম ছিল রেল এবং নৌপথ। নৌপথে ছিল স্টিমার, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল এবং ইঞ্জিন চালিত জাহাজে টানা বিশাল আকৃতির সব বার্জ, যার দু-একটা এখনও দৌলতদিয়া এবং মাওয়া রুটে যানবাহন পারাপারের ফেরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ছিল নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী পাল তোলা বিশাল আকৃতির সব নৌকা। মাদকসহ অন্যান্য সব বস্তুর চোরাচালান রেল ও নৌপথে স্টিমার, বার্জ, লঞ্চ এবং নৌকার মাধ্যমে হতো। ফলে এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স

ব্যুরোর কর্মকর্তা কর্মচারীদের রেলপথ এবং নৌপথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা চৌকি বসিয়ে বা প্রিভেন্টিভ পার্টি অফিস খুলে নিয়াগে দেয়া হয়।

গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সেট আপ এবং কার্যক্রমের তেমন কোনো পরিবর্তন ছিল না। দেশে ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নতুন নতুন রাস্তাঘাট ও সড়ক মহাসড়ক তৈরি হতে থাকলে মানুষের চলাচল ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসতে থাকে। পলি জমে জমে অনেক নদী ক্রমান্বয়ে নাব্যতা হারাতে থাকলে অনেক স্থানে নৌপথে চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ষাটের দশক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বহু রুটে স্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসব রুটে লোক চলাচল না থাকায় মাদকের চোরাচালানও বন্ধ হয়ে বিকল্প রুটে মাদক চোরাচালান শুরু হয়।

১৯৪৭-এর দেশ ভাগের ফলে যেসব রেলপথ ভারতীয় ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সীমান্তবর্তী এলাকায় সেগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসব রেলপথে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য স্থাপিত এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং স্পেশাল প্রিভেন্টিভ পার্টি ও বহু পাহারা চৌকি অকেজো এবং কর্মহীন হয়ে পড়লে এখানকার কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের এসব স্থান থেকে প্রত্যাহার করে এনে অন্যত্র কাজে লাগানো হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলোদশে বহু পরিত্যক্ত রেলপথ সংলগ্ন এলাকায় এ ধরনের পরিত্যক্ত এক্সাইজ পাহারা চৌকি ছিল এবং এখনও এসব স্থানে প্রাক্তন এক্সাইজ বিভাগের জায়গা জমি রয়েছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে কর্মরত বহু ডিপার্টমেন্টকে একীভূত করে একটি অভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হলেও এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এক্সাইজকে কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের সাথে 'কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ' নামে একীভূত করে নবগঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত হয়। এসময় প্রাদেশিক এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকেও এক্সাইজ এন্ড এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এ সময় বৃটিশ আমলের চেয়ে এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর জনবল অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেকটা অস্পৃশ্য হওয়ায় রাজস্বের প্রয়োজনে বেঙ্গল এক্সাইজের খন্ডিত অংশ প্রভিন্সিয়াল এক্সাইজ নামে কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে গেলেও এর জনবল বৃদ্ধি কিংবা সাংগঠনিক উন্নয়নের কখনও কোনো উদ্যোগ ছিল না। ফলে অবহেলিত প্রভিন্সিয়াল এক্সাইজের আরো অবহেলিত ইন্টেলিজেন্স শাখাটি গোটা পাকিস্তান আমল জুড়েই কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, বৃটিশ আমল থেকে চলে আসা এক্সাইজ কমিশানারের পদটি যুগ্মসচিব পদ মর্যাদার এবং ইন্টেলিজেন্স শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার পদটি উপ সচিব পদমর্যাদার হলেও ১৯৬৬ সালের ইপি অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে পদ দুটিকে অবমূল্যায়িত ও অবনমিত করে যথাক্রমে উপসচিব পদমর্যাদার Director of Excise and Taxation এবং উর্ধ্বতন সহকারি সচিব পদমর্যাদার Deputy Director of Excise and Taxation পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়।

নবগঠিত পাকিস্তানে প্রভিন্সিয়াল এক্সাইজের ইন্টেলিজেন্স শাখার গোয়েন্দা কাজের অর্জন বা সফলতাও তেমন একটা চোখে পড়ার মতো নয়। এখানে পদায়িত কর্মকর্তা কর্মচারীরাও একে একটা Dumping Ground মনে করতেন, এবং গোয়েন্দা কাজ বা গোয়েন্দা তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণ ছিল খুব নগণ্য। ১৯৭১ সালের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাধিকারের মধ্যে এক্সাইজ ও এর ইন্টেলিজেন্স শাখার উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ ছিল না।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের সাথে একীভূত

করার বহু প্রচেষ্টা এবং দুই এক্সাইজকে একীভূত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এক্সাইজ কর্মকর্তাদের কাস্টমস ও এক্সাইজ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রাক্তন প্রাদেশিক এক্সাইজ-এর মাদক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও উভয় সংস্থার কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ চেতনা-উদ্ভূত দ্বন্দ্বের কারণে শেষ পর্যন্ত দুই এক্সাইজ একীভূতকরণের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অতঃপর এক্সাইজ ও এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স অংশটুকু ইনকাম ট্যাক্সের সাথে একীভূত হয়ে এক্সাইজ অংশটুকু নারকটিকস এন্ড লিকার নাম নিয়ে ১৯৭৭ সালে নতুন পরিদপ্তর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন এ পরিদপ্তরে প্রাদেশিক এক্সাইজের নির্বাহী অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত হলেও এর এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স অংশটুক নারকটিকস ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (NIB) নামে Directorate of Customs Intelligence and Investigation-এর সাথে সংলগ্নীকৃত হয়ে মূল এক্সাইজ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এভাবে প্রায় ৬ বছর চলার পর ১৯৮২ সালে মার্শাল ল' কমিটির স্মারক নং 7162/1/1/Impl-3/619 তারিখ 19/12/02 এর আদেশ মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং 1(4)Admn II/83/1076 dated 09/08/83 মোতাবেক Directorate of Customs Intelligence and Investigation এর সাথে সংলগ্নীকৃত Narcotics Intelligence Branch (NIB)-টি এর মোট ৪৯টি পদ (ডেপুটি কন্ট্রোলার ১টি, সুপারিন্টেন্ডন্ট ২টি, ইন্সপেক্টর ৮টি, সাব-ইন্সপেক্টর ৯টি, স্টেনো টাইপিষ্ট ১টি, টাইপিষ্ট কাম-এলডিএ ১টি, ড্রাইভার ১টি, সিপাই ২৬টি) নিয়ে পুনরায় নবগঠিত নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরে ফিরে আসে।

১৯৭৭ সালে নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের ১৯৬১ সালের মাদক বিষয়ক সিঙ্গেল কনভেনশনের ১৭ নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭১ সালের কনভেনশনের ৬ নং অনুচ্ছেদের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য Special Administration হিসেবে। কিন্তু বাস্তবে দেশে ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এ পরিদপ্তরে Special Administration-এর কিছুই ছিলনা। এর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি রাজস্ব আয়কারী সংস্থা হওয়াতে রাজস্ব আয়কারী কাস্টমস ও ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের উন্নয়ন ও তদারকির ব্যাপারে যতটা যত্নশীল ছিল, নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরের ব্যাপারে ততটা ছিলনা। (কেননা এ পরিদপ্তর মাদক থেকে যে রাজস্ব দিত, তারচেয়ে একটি প্রাইভেট কোম্পানি বিদেশে ব্যাঙের পা রপ্তানি করে বেশি টাকা আয় করতো)। এ পরিদপ্তরের গোয়েন্দা কাজ দূরে থাক, প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমের জন্যও তেমন কোনো জনবল সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন বা লজিস্টিক ছিল না। এ পরিদপ্তরকে উপহাস অর্থে বলা হতো "ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।"

১৯৭৮ সালে এ পরিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা 'কন্ট্রোলার অব নারকটিকস এন্ড লিকার' প্রণীত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় সে সময় এ পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ২১টি বৃহত্তর জেলা কার্যালয়, গোয়েন্দা শাখা এবং অনেকগুলো স্পেশাল প্রিভেন্টিভ পার্টি মিলিয়ে মোট মঞ্জুরীকৃত জনবল ছিল ১ জন কন্ট্রোলার, ৬ জন ডেপুটি কন্ট্রোলার, ২১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার, ২৮ জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ১২৫ জন ইন্সপেক্টর, ৫৫ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ৪৮০ জন সিপাইসহ মোট ৭১৬ জন। যানবাহন বলতে ছিল কন্ট্রোলারের জন্য একটি কার, ৫ জন ডেপুটি কন্ট্রোলারের জন্য ৫টি কার, এবং জেলা পর্যায়ে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের জন্য দুইটি মাইক্রোবাস। এ গাড়িগুলো অনেক পুরাতন হওয়ায় অধিকাংশ সময় অকেজো হয়ে পড়ে থাকতো। ফলে অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা কাজের জন্য কর্মকর্তাদের স্বল্প দুরত্বে পায়ে হেটে , রিক্সায় এবং বেশি দূরত্বে বাস বা ট্রেনে ভ্রমণ করতে হতো।

পাকিস্তান আমলের পরে এ পরিদপ্তরে তেমন কোনো নব নিয়াগে না হওয়ায় এবং অবসরজনিত কারণে ক্রমান্বয়ে পদ শূন্য হওয়ায় মঞ্জুরীকৃত ৭১৬টি পদের অর্ধেকের বেশি খালিই পড়ে থাকতো। ১৯৮১ সালে আমিসহ(লেখক) এ পরিদপ্তরে মোট ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার যোগদান করার পরেও অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলারের ২১টি পদের মধ্যে মাত্র ১২টি পদে কর্মকর্তা ছিলেন।

এক একজন কর্মকর্তা সে সময় তৎকালীন ২১টি বৃহত্তর জেলার মধ্যে ২ থেকে ৩টি করে বৃহত্তর জেলার দায়িত্ব পালন করতেন। সার্কেল অফিসগুলো বর্তমানের জেলা তথা মহকুমা পর্যায়ের হলেও ২০টি মহকুমা তথা বর্তমান জেলায় এ পরিদপ্তরের কোনো অফিসই ছিল না। সারা দেশের গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানোর জন্য মাঠ পর্যায়ে যে ৪৫টি পদ ছিল, তার প্রায় সবই খালি পড়ে থাকতো। কারণ নির্বাহী পদে অপরাধ দমন কাজেই যেখানে জনবল ছিল না , সেখানে গোয়েন্দা কাজের জন্য লোক নিয়োগ অনেকটা বিলাসিতার মতো ছিল। ফলে দেশ স্বাধীন হবার পরে পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা কার্যক্রম প্রায় ছিলই না বলা চলে ।

১৯৮৯ সালে নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর যখন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হিসেবে পুনর্গঠিত হচ্ছিল তখন ঘটনাচক্রে সে পুনর্গঠন কাজে আমি (লেখক) সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অফিসের মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী ছিলেন নতুন এ অধিদপ্তর ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্বে। মাদক অপরাধ দমনে গোয়েন্দা কাজের সামগ্রিক গুরুত্ব অনুধাবন করে নবগঠিতব্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে গিয়ে অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত পরিচালক (অপারেশন ও গোয়েন্দার) এর অধীনে তৎকালীন ৪ বিভাগে ৪ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, ৮ জন সহকারী পরিচালক, ২০ জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ৫২ জন পরিদর্শকসহ মোট ২৫৬ জনের একটা গোয়েন্দা শাখার সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করাই। রাষ্ট্রপতির অফিসের মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গড়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও তিনি ছিলেন সেসময় পুরো সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর জন্য গঠিত 'মুয়ীদ কমিটি'র সভাপতি। তাঁর লক্ষ্যই ছিল সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, অধিদপ্তর এবং সংস্থার বিদ্যমান মাথাভারী প্রশাসনের কোথায় কিভাবে ছুরি কাঁচি চালিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশকে ছেটে ফেলে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়ভার হ্রাস করা যায়।

যাঁর লক্ষ্যই হচ্ছে সবকিছু ভেঙ্গে চুরে ছোট করে ফেলা, তাঁর হাতের তলায় নতুন কিছু গড়ে ওঠা আসলেই খুব কঠিন কাজ ছিল। সে সময় কম্পিউটার ছিল না। কাজেই টাইপ মেশিনে টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজ আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে জায়নামাজের মতো বিশাল অর্গানোগ্রাম যখন তাঁর সামনে পেশ করি, তখন তাঁর চোখ ছানাবড়া, কপালে ভাঁজ, ভ্রু কুচকানো, চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। তিনি ডাইনে বায়ে না সূচক মাথা নাড়া শুরু করলেন।

মুয়ীদ চৌধুরীর একটি গুণ ছিল। তাঁর সাথে যুক্তি দিয়ে তর্ক করা যেত। তিনি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন না। মাদক সমস্যার আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আমার যত জ্ঞান ছিল তার সবই এক এক করে অকাতরে তাঁর সামনে যুক্তি তর্ক আকারে ঝাড়তে শুরু করলাম। অপরাধ দমনের যাবতীয় কাজের মূল ভিত যে গোয়েন্দা কার্যক্রম, এটা নানাভাবে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করতে করতে এক সময় বরফ গলা শুরু করলো। তিনি গভীর মনোযোগে তাঁর টেবিল জুড়ে পাতানো কাগজ জোড়া দিয়ে আমার বানানো বিশাল অর্গানোগ্রাম পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন এবং এক সময় কলম হাতে নিয়ে এর উপর কাটাকাটি শুরু করলেন। কখনও কলমে, কখনও পেন্সিলে তাঁর কাটাকাটি চললো বেশ কয়েক দিন ধরে। কাটার পাশাপাশি লিখলেনও অনেক কিছু। কোথাও বাড়ানো, কোথাও কমানো। কোথাও নির্দেশনা। কখনও পেন্সিলে, কখনও কলমে আমার তৈরি অর্গানোগ্রামের উপর তাঁর কাটাকাটি এবং হাতে লেখা নির্দেশনা গত ৩০ বছর ধরে এখনও আমি সংরক্ষণ করে যাচ্ছি। কেননা এগুলো একটি অধিদপ্তরের জন্মের প্রকৃত ইতিহাস।

যা বলছিলাম, মুয়ীদ চৌধুরীর কাটাকাটির পর আমার প্রস্তাবিত নবগঠিতব্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা অধিশাখার জন্য প্রস্তাবিত ২৫৬টি পদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ১৪২টি পদ টিকলো। কিন্তু মুয়ীদ চৌধুরীর কাটাকাটির নেশা এখানেই থেমে থাকেনি। এক একবার চূড়ান্ত করি, আর তাঁর সামনে পেশ করার পর শুরু হয় নতুন করে কাটাকাটি। এভাবে তিন চারবার কাটাকাটির পর শেষ পর্যন্ত নবগঠিতব্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার জন্য টিকলো মাত্র ৬৯টি পদ।

কাটাকাটির এখানেই শেষ নয়। অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণের জন্য রেওয়াজ মাফিক এটা তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের "ও এন্ড এম" শাখায় গেলে সেখানে পুরো বিষয় তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে পাস করিয়ে আনার জন্য আমাকে ডেপুট করা হলেও "ও এন্ড এম"-এর সাথে অনেক যুদ্ধ করেও আমি পরাজিত হই। পুরো অর্গানোগ্রামের উপর তারা নির্মমভাবে ছুরি, কাঁচি চালালো। নবগঠিতব্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য সব অধিশাখা, শাখা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাথে গোয়েন্দা শাখাও আবার কাটাকাটির শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে টিকলো মাত্র ৫২টি পদ।

ভূমিষ্ঠ হার সময় কোনো সন্তানের যদি হাত পা, চোখ, নাক, কান, মুখ না থাকে, তাহলে তার অবয়ব যেমন হয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্ম হলো অনেকটা সেভাবেই। নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরের ৭১৫ জনের পরিবর্তে নবগঠিত এ অধিদপ্তরের জনবল হলো ১২৭৪ জন এবং গোয়েন্দা শাখার পূর্ববর্তী এক্সাইজ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও পরবর্তী নারকটিকস ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ৪৯টি পদের স্থানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আসা চিকিৎসা বিষয়ক পদগুলোসহ এ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার জনবল হলো ৫২। অর্থাৎ বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে যা ছিল, ১৯৯০ সালে নবগঠিত নারকটিকস গোয়েন্দা শাখায় তারচেয়ে মাত্র ৩টি পদ বৃদ্ধি পেল।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার সৃষ্টি হয়েছিল মূলতঃ দেশের সর্বত্র মাদক পরিস্থিতি এবং মাদক অপরাধের গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার মতো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে মাদক বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করাও এ শাখার একটি গোপন কাজ হতে পারতো। কিন্তু গত ৩২ বছর ধরে মাদক গোয়েন্দা শাখা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কিংবা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপর মাদক বিষয়ক কোনো কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। দেশের মাদক পরিস্থিতি তথা মাদকের উৎপাদন, চোরাচালান, বিক্রয় ও ব্যবহারের গতি প্রকৃতির উপর এখনও মাদক গোয়েন্দা শাখা থেকে কোনো রিপার্টে প্রণীত হয় নি। গোয়েন্দা শাখা থেকে মাদক অপরাধের যেসব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এবং অপারেশন কাজে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের মাদক অপরাধ দমন ইউনিটগুলোকে সরবরাহ করা হয়, তারও কোনো পরিসংখ্যান নেই। শুধু ২০১৩ সালে প্রকাশিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের Annual Drug Report থেকে দেখা যায় ঐ বছর গোয়েন্দা শাখা মোট ১২৬৯টি মাদক অপরাধের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে নিজেরা এর ভিত্তিতে ৯৩৭টি অভিযান পরিচালনা করে ২৩৯টি মামলা উদঘাটন করে এবং ৩৩৭টি তথ্য অপারেশন শাখাকে দেয়।

অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা গোয়েন্দা শাখার মুখ্য কাজ না হলেও বৃটিশ আমল থেকে আজ অব্দি এ শাখাটি তার স্বল্প জনবল ও শক্তি নিয়ে অপারেশন শাখার সমান্তরালে থেকে মাদক অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০২০ সালে অপারেশন শাখা যেখানে হেরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা, ইয়াবা ও ইনজেকটিং ড্রাগের মোট ১৪,৭৩৫টি মামলা করেছে সেখানে গোয়েন্দা শাখা তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে ৫৯১ টি মামলা করেছে । এসব মামলার মাদক উদ্ধার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা শাখার অর্জনও খারাপ নয়। কিন্তু মূল কথা হলো গোয়েন্দা শাখার কাজটা অতি গোপনীয় হলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দারা সবসময় দিনের আলোর মতো প্রকাশ্য।

অধিদপ্তরের অপারেশন শাখা তাদের প্রকাশ্য তৎপরতায় অপরাধের যেসব তথ্য সংগ্রহে অপারগ সেসব তথ্য সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ এবং নানান প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেসব গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে অপারেশন শাখাকে সরবরাহ করাই হলো গোয়েন্দা শাখার মূল কাজ। গোয়েন্দারা যদি অপারেশন শাখার লোকদের মতো প্রকাশ্যে এসে অপারেশন-এর কাজ করে, তাহলে তাদের পরিচয় এবং কার্যকলাপ আর গোপন থাকে না।

মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ঃ প্রয়োজন সকলের অঙ্গীকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী

একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং শব্দ সৈনিক (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র)
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস (মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা)
সদস্য, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি
অধ্যাপক, বারডেম হাসপাতাল।

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮৯ সাল থেকে ২৬ শে জুন তারিখে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরাধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। দিনটি পালনের উদ্দেশ্য হলো মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং মাদকের অবৈধ পাচার বন্ধ করা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহারের কারণে সারা বিশ্বে আজ বহুবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাদক দেশের উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। মাদকাসক্তি দেশের প্রাণশক্তি যুবসমাজকে ধ্বংসের মাধ্যমে উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। মাদক শুধু ব্যক্তি জীবনকে ধ্বংস করে না, বরং ধ্বংস করে গোটা পরিবারকে, তৈরি করে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, সেই সাথে কলুষিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে। মাদকাসক্তি বৃদ্ধির কারণে জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষত আমাদের দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ যুব-সমাজের একটি বিরাট অংশ বর্তমানে মাদকের ঝুঁকিতে আছে।

একটা ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার রাসায়নিক গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর। এই ড্রাগ অপব্যবহারের কারণে রোগীর জন্য তার রোগের ঔষধের গুণাগুণ পাওয়ার বদলে হয়ে যায় বিষ। অনেক সময় বিষ স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে হয় ঔষধ, কিন্তু বেশী মাত্রা বা অযথা গ্রহণ করলে হয় বিষাক্ত যা শরীরকে নিস্তেজ করে, মৃত্যু ডেকে আনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদকাসক্তির সূচনা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিকায়নের নেতিবাচক প্রভাব, পারিবারিক-সামাজিক চাপসহ নানান কারণে তরুণদের মধ্যে হতাশা-বিষন্নতা ভর করছে। এর জেরে ঘটছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে মাদকাসক্তিতেও ঝুঁকছেন অনেক তরুণ-তরুণী। দিন দিন এমন অবসাদগ্রস্ত তরুণ-তরুণীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় বাড়ছে মাদকের চাহিদা। সেই চাহিদার যোগান দিতে বাড়ছে চোরাচালানও। এই চাহিদার প্রয়োজন মেটাতেই মাদকের ধরনও পাল্টাচ্ছে বছর বছর। এক সময় দেশের মাদকের বাজারে গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবার আধিপত্য থাকলেও সম্প্রতি বিস্তার ঘটছে আলোচিত ক্ষতিকর মাদক আইস (মেথামফিটামিন) বা ক্রিস্টাল মেথের। বিভিন্ন সংস্থা ও অধিদফতরের তথ্য অনুসারে, বছরে দেশে আসছে শত কোটি টাকার আইস বা ক্রিস্টাল মেথ। সম্প্রতি একটি অভিযানে ধরা পড়েছে অর্ধশত কোটি টাকার আইস।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের সম্পর্কে কিছু তথ্য:

মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ মাদকের বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এশিয়ার গোল্ডেন

ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ওয়েজ নামে পরিচিত মাদক চোরাচালানের তিনটি প্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রে বাংলাদেশের অবস্থান। তাই আন্তর্জাতিক মাদক কারবারীরাও বাংলোদশকে ট্রানজিট হিসেবে সহজে ব্যবহার করতে পারছে। বাংলাদেশকে মাদক আসার পথ (রুট) নিয়ে গবেষণা করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর (ডিএনসি)। সেখানে তিনটি অঞ্চলের মধ্যে আছে মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ডের সীমানা মিলে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল । এটি বাংলাদশের পূর্বে অবস্থিত। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সীমানা রয়েছে। মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের পথ হিসেবে ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে একত্রে বলা হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট। এই অঞ্চল বাংলাদেশের পশ্চিমে। আর গোল্ডেন ওয়েজ হচ্ছে ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, নেপাল ও ভুটানের কিছু অংশ। এই অংশ বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত। এ তিন অঞ্চলের কেন্দ্রে থাকা বাংলাদেশের ওপর চার দশকের বেশি সময় ধরে মাদক কারবারীরা চোখ রাখছে। শুরুর দিকে মাদক চোরাচালানের তালিকায় হেরোইন ও ফেনসিডিলের আধিক্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে অন্য মাদকও যুক্ত হতে থাকে। এরমধ্যে গত এক দশকে দেশে ইয়াবার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। আর ইয়াবা তৈরির মূল উপাদান মেথামফিটামিন আসছে বছর দুই ধরে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, মাদক চোরাচালানে বহুমাত্রিকতা এসেছে। চোরাচালানকারীরা এখন ডার্কওয়েব ব্যবহার করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এতে কোনো ধরনের তথ্য পাচ্ছে না। লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বিট কয়েন। এ কারণে মাদক চক্রকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। মাদক কারবারীরা যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করছে, সে অনুযায়ী আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নেই। সক্ষমতা অর্জনে উদ্যোগ না নিলে দেশে আরও বেশি মাদকের ঝুঁকি তৈরি হবে। বাংলাদেশে মেথামফিটামিন আইস বা ক্রিস্টাল মেথ নামে পরিচিত। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ও গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অঞ্চলে এ আইসের উৎপাদন উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের অন্তর্ভূক্ত মিয়ানমার যে ছয়টি দেশের বাজার সামনে রেখে আইস উৎপাদন করছে, এরমধ্যে বাংলোদশও রয়েছে বলে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা ইউএনওডিসির সর্বশেষ বৈশ্বিক মাদক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না। কিন্তু মাদক পাচারের রুট এবং সীমান্তে এর কয়েকটি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব মতে), মাদকাসক্তদের ৮০% যুবক, ৪৩% বেকার এবং ৬০% বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত, ৪০% অশিক্ষিত, ৪৮% মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ৯৮% ধূমপায়ী, ৫৭% অবৈধ যৌন অপরাধী,৭% ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাকারী এইচআইভি আক্রান্ত। দুস্থ মহিলা এবং পথশিশুরা মাদক বিক্রয় এবং বহনে অধিক হারে নিয়োজিত হচ্ছে।

মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে মনোবিজ্ঞানীরা নানাবিধ কারণ ব্যাখ্যা করেছেন

যেমন:

মাদকসেবীদের চাপ- বন্ধুদের চাপ, নেশার প্রতি কৌতুহল, সহজ আনন্দ লাভের বাসনা-বিভিন্ন উৎসব পার্টিতে, হতাশা/বিষাদ/ পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট, প্রতিকুল পারিবারিক পরিবেশ এবং পারিবারিক পরিমন্ডলে মাদকের প্রভাব, ধর্মীয় অনুভূতির অভাব, শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়টির অনুপস্থিতি, চিকিৎসা সৃষ্ট আসক্তি, মাদকের সহজলভ্যতা, ধূমপানের অভ্যাস ইত্যাদি।

মাদকের নাটের গুরু হচ্ছে সিগারেট, গবেষণায় দেখা যায় মাদকাসক্তদের ৯৮ ভাগই ধূমপায়ী। সুতরাং তরুণদের শিশুকাল থেকে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে এর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন একটি ক্রাস প্রোগ্রাম। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নারী ও শিশু-কিশোরেরাও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যেও মাদকাসক্তির সংখ্যা বাড়ছে। এটা উদ্বেগের কারণ। নারী আসক্তদের ৯০ ভাগের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। বাদবাকি ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে।

মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন নারী। তাদের মধ্যে ছাত্রী, গৃহিনী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী রয়েছেন। মাদকাসক্তদের শতকরা ৬০ ভাগ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। সমাজে যত ধরনের সন্ত্রাস, ধর্ষণ, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, ইভটিজিং, সড়ক দূর্ঘটনা তার মূল কারণই হচ্ছে মাদক।

মাদকাসক্তির কারণে স্বল্প মেয়াদি প্রতিক্রিয়া

মাদকাসক্তির কারণে ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন আকর্ষণের অনুভূতির অভাব দেখা দেয়। শারীরিক অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি করা, ঘাম হওয়া, চুলকানি এবং চলাফেরায় সমন্বয়ের অভাব অথবা মাথা ঘুরানো। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতোই আফিম জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারকালে গাড়ি অথবা মেশিন চালানোর মতো কাজ বিপদজনক। অধিক মাত্রায় মাদক গ্রহণের ফলে চোখের মনি সংকুচিত এবং চামড়া স্যাঁত স্যেঁতে ও শীতল হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে থেমে যেতে পারে।

মাদকাসক্তির কারণে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘ দিন ধরে মাদক গ্রহণের ফলে মধ্যে ফুসফুসের সমস্যা দেখা দিতে পারে অথবা যকৃত ও মস্তিস্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। অপরিস্কার সুঁচ অথবা সিরিঞ্জ ব্যবহারের কারণে এইচআইভি এইডস, হেপাটাইটিস বি ও ধনুষ্টংকার দেখা দিতে পারে। মাদকাসক্ত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুরও মায়ের কাছ থেকে মাদকাসক্তি ও রোগ সংক্রমণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করলে কোনো মাদক জীবনের সকল বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা সৃষ্টি করে। মাথা ব্যথা, পাকস্থলির গোলযোগ, চামড়ার ফুসকুড়ি এবং ক্রোধ ও বিরক্তির অনুভূতি হতেও দেখা যায়। মাদকাসক্ত মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানের যকৃত, মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়, জন্মের পর এসব শিশুর মধ্যে প্রত্যাহারজনিত লক্ষণসমূহ দেখা দিতে পারে।

ভয়ঙ্কর ইয়াবা

বাংলোদশের শহর জনপদের ধনী পরিবারের সন্তানদের মধ্যে সম্প্রতি ইয়াবা আসক্তির যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা সমগ্র জাতির জন্য এক ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী । ইয়াবা কেবল আমাদের তরুণ প্রজন্মের প্রাণশক্তি ও মেধাকে ধবংস করছে না, ইয়াবার কারণে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপসংস্কৃতি ও অপরাধের বিস্তার ঘটছে। ইয়াবার অপর নাম Crazy Medicine বা উত্তেজক ঔষধ। রাসায়নিক চরিত্র, শক্তি, কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া বিচারে অ্যামফিটামিন, মেথামফিটামিন কিংবা কোকেনের চেয়েও ইয়াবা শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। দীর্ঘদিন ইয়াবা ব্যবহারে hallucination তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে ফুসফুস, লিভার এবং কিডনী নষ্ট হয়। এ নেশায় আসক্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত মাত্রায় প্রয়োজনীয় ফলোদয় না হলেও চরম অবসাদ, হতাশা, বিষাদ ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। ব্যবহারকারী তখন যেকোন রকম অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে পারে, এ অবস্থায় মানুষ খুন করাও বিচিত্র কিছু নয়। এমনকি এটা হতাশা থেকে মাদকাসক্তকে আত্মহত্যার দিকেও নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে বছরে শুধু ইয়াবা বড়িই বিক্রি হচ্ছে ৪০ কোটির মত , যার বাজার মূল্য হচ্ছে ৬ হাজার কোটি টাকা (প্রতিটি ১৫০ টাকা)। ইতোমধ্যেই দেশে ইয়াবা আসক্তের সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করছে বিভিন্ন সংস্থা। ইয়াবার আগ্রাসন রুখতে ২০১৮ সালের ৪ মে থেকে সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। সম্প্রতি যে ইয়াবা তৈরি হচ্ছে এতে মেথামফিটামিনের উত্তেজনাকে Balance করার জন্য তার সাথে ক্ষেত্র বিশেষে মরফিন বা হেরোইন জাতীয় নারকটিক অ্যানালজেসিক, কিংবা অন্য কোন depressant drug মেশানো হয়। এসব ভেজাল মেশানোর কারণে ইয়াবা অনেক সময় জীবন বিধ্বংসী হয়ে ওঠে ।

ক্রিস্টাল মেথ পাচারের নেপথ্যে

সম্প্রতি ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছে ভয়ংকর মাদক ক্রিস্টাল মেথ। এগুলো সেবনে মৃত্যু অপরিহার্য। তারপরও যুব সমাজ এর দিকে ঝুঁকছে। আগে থেকে ইয়াবায় আসক্ত মাদকসেবীদের মধ্যে ক্রিস্টাল মেথ (আইস ও গ্লাস নামেও পরিচিত) গ্রহণের আগ্রহ বেশি। মাদক ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করছে এ দামি মাদকটি। এক বছরে রাজধানীতে ক্রিস্টাল মেথের তিনটি চালান

জব্দ হয়েছে। ইদানীং মাদকটির বিস্তার ঘটতে শুরু করায়, নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি হচ্ছে ক্রিস্টাল মেথ। ক্রিস্টাল মেথামফিটামিনের সংক্ষিপ্ত নাম ক্রিস্টাল মেথ। দেখতে স্বচ্ছ পাথরের মতো এবং এর রং নীলাভ সাদা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সজাগ ও উদ্দীপ্ত রাখতে মেথ ব্যবহারের কথা শোনা গেছে । ক্রিস্টাল মেথ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায়, এমতাবস্থায় অনেকের মৃত্যুও হয়। অন্যান্য মাদক দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীরা এসব মাদকের দিকে ঝুঁকছে। নেশার জগতে সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভয়ঙ্কর মাদক ক্রিস্টাল মেথ। ইয়াবার বিকল্প হিসেবে মাদকসেবীদের কাছে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে মাদকের নতুন এ সংস্করণ। চাহিদা উর্ধ্বমুখী হওয়ায় মিয়ানমার ও বাংলাদেশভিত্তিক মাদক মাফিয়ারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্রিস্টাল মেথ ।

ইয়াবা কারবারীদের একটি অংশ বর্তমানে ক্রিস্টাল মেথ পাচার করছে। মাদক চক্রের হোতারা আড়ালে থেকে ক্যারিয়ারদের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ক্রিস্টাল মেথ পাচার করছে। এরই মধ্যে তদন্তে কিছু ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে যাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। দেশে গাণিতিক হারে বাড়ছে ক্রিস্টাল মেথের চাহিদা। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মজুদ হচ্ছে এ মাদক। ইয়াবার পুরনো রুট দিয়ে দেশে প্রবেশ করছে ক্রিস্টাল মেথ। ইয়াবার মতো সর্বনাশা রূপ ধারণ করার আগেই এর আগ্রাসন বন্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ক্রিস্টাল মেথের আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করে মিয়ানমারভিত্তিক কয়েকটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। যার মধ্যে রয়েছে মিয়ানমারভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী সংগঠন এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রুপ । তাদের সহযোগী হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশের মাদক মাফিয়ারা। মাদকের স্বর্গরাজ্য খ্যাত মিয়ানমারের শান স্টেট থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্বারা মিয়ানমারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক মাফিয়াদের সহায়তায় মেথ নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশি সীমান্ত এলাকায়। এরপর ২৮টি রুটের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয় বাংলাদেশে। ক্রিস্টাল মেথ বাংলাদেশে প্রবেশের পর কক্সবাজার ও টেকনাফের কয়েকটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পাচার করা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের জেলেদের মাধ্যমে মাছ ধরার ট্রলারের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এ মাদকের চালান। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্রিস্টাল মেথ পাচারে জড়িত অর্ধ শতাধিক চক্র।

আইস পূর্বে উত্তর আমেরিকায় উৎপাদিত হতো। ২০১৫ সাল পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা ছিল আইসের মূল উৎপাদনকারী অঞ্চল। কিন্তু সেই উত্তর আমেরিকা ছাড়িয়ে তা এখন এশিয়াতেও উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আইস ল্যাব স্থাপনের প্রবণতা বেড়েছে। এ দেশগুলোর মধ্যে ইরান, চীন, আফগানিস্তান ও মিয়ানমারে আইসের উৎপাদন বাড়ছে। পাশাপাশি এশিয়ায় আইসের বড় বাজারও তৈরি হয়েছে।

নিত্য নতুন কৌশলে জেলের ছদ্মবেশে নৌকায় মাছের আড়ালে ইয়াবা ও আইস আনা হচ্ছে

বর্ডার গার্ড বাংলোদশের (বিজিবি) চোখ ফাঁকি দিয়ে চায়ের প্যাকেটের ভিতর লুকিয়ে, মাছের বরফের সঙ্গে নতুন মাদক আইস আনছে মাদক চোরাকারবারীরা। এক্ষেত্রে তারা প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। বিজিবি সদস্যরাও গোয়েন্দা

তৎপরতা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্তে আইসের চালান প্রতিহত করছে। এ নিয়ে মাদক চোরাকারবারীদের সঙ্গে বিজিবির ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছে। আইস সীমান্ত দিয়ে আসলেও তা ঢাকায় যাচ্ছে। ঢাকার অভিজাত পরিবারের লোকেরা উচ্চমূল্যে এই মাদক সেবন করেন। তাই যতদিন পর্যন্ত মাদকের চাহিদা কমানো ও এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, ততদিন পর্যন্ত এ মাদকের চালানও ঠেকানো সম্ভব নয় ।

বিজিবির অভিযানে এক মাসে ২১১ কোটি টাকার মাদক জব্দ

বর্ডার গার্ড (বিজিবি) গত জানুয়ারী, ২০২২ মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২১১ কোটি ৬৭ লাখ ৯৮ হাজার টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য, চোরাচালান সামগ্রী ও অস্ত্র এবং গোলাবারুদ জব্দ করেছে। এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযাগে ২৭৬ জন এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ২১৮ জন বাংলাদেশি ও ১৩ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবির সদর দফতর।

মাদক গ্রহণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও দেহের ক্ষয়ক্ষতি

মাদকাসক্তির ভয়ঙ্কর চিত্র হচ্ছে যে প্রয়োজনের বেশী অথবা নিয়মিত মাদক গ্রহণের ফলে এসব ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, কোকেন গ্রহণকারী মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা নানান ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ,তার মধ্যে কিডনি, লিভার ছাড়াও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে মাদক গ্রহণকারীরা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাছাড়া ইনজেকশন এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণের কারণে দেশে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের অনেকগুলো কারণের মধ্যে মাদকাসক্তি একটি বড় কারণ। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, জীবনীশক্তি ধ্বংসকারী ইয়াবা সেবনকারীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন এবং যৌনশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন চিরতরে।

মাদকসেবীরা তাদের মাদক কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে অবৈধ মাদক ব্যবসা, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ ও ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকাসক্তির কারণে সমাজে সকল ধরনের অনাচার ও অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন মাদকাসক্ত তার নেশার পেছনে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৫০০ থেকে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা খরচ করে। তবে বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই দৈনিক খরচ ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। আর পক্ষান্তরে এই নেশার টাকার যোগান দিতে আসক্তরা বেছে নেয় বিভিন্ন অন্যায় পথ। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদক ব্যবহারজনিত ব্যয় বছরে ৫৬ হাজার ৫৬০ টাকা থেকে ৯০ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত। সে হিসাবে ৭৫ লাখ মাদকসেবী বছরে অন্তত ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। অন্যদিকে সারাদেশে প্রায় ৩০ লাখ মাদক ব্যবসায়ী প্রতিদিন কমপক্ষে প্রায় ২০০ কোটি টাকার মাদক কেনাবেচা করে। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে খুন, ছিনতাই, ডাকাতির মতো ঘটনা। মাদক এখন সকল অপরাধ ও সন্ত্রাসের জনক, একজন যখন অপরাধের জগতে পা বাড়ায়, তখন পা রাখে ড্রাগ বা মাদকের নেশায়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে দেশে মাদকাসক্তির কারণে যুব সমাজের জীবনই শুধু বিপন্ন হয় না, এতে গোটা পরিবার বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলোদশ সরকারের কয়েকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

১)মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের আইন ও শাস্তির বিধান- সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড

সম্প্রতি বাংলাদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা নিসন্দেহে আমাদের জন্য একটি সুসংবাদ। ৫ গ্রামের বেশি ইয়াবা, ২৫ গ্রামের বেশি হেরোইন বা কোকেন উৎপাদন/পরিবহণ ও বিপণনের পাশাপাশি সেবনের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। পরিমাণ কম হলে ২-১০ বছরের কারাদন্ড। হেরোইন, ফেনসিডিল, আফিম, মরফিন, নেশার ইনজেকশন, গাঁজা, ভাং, মদ, তাড়ি, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদিও উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহন, ক্রয়- বিক্রয় ও ব্যবহার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে

নিষিদ্ধ ও মারাত্মক অপরাধ। এসব অপরাধ দ্রুত বিচার আদালতে বিচার্য এবং এক্ষেত্রে সাধারণতঃ জামিন দেয়া হয়না। মাদক অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সড়ক পরিবহন আইন বলছে, মদ্যপান করে বা নেশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে গাড়ি চালালে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদন্ড বা ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।

২)মাদক গ্রহণ করলে সরকারি চাকরি নয়

মাদক গ্রহণ করে কেউ সরকারি চাকরি পাবে না। ডোপ টেস্ট ছাড়া কেউ সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে পারবে না। মাদক থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে না পারলে বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ পূরণ হবে না। দেশের মানুষ এখন আর আগের মতো খোলা জায়গায় ধূমপান করেন না। তাদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতাবোধ তৈরি হয়েছে। এই সচেতনতাবোধ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৩) মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে

মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানে ২৫ হাজার ৫৭৫ টি মামলা হয়েছে। অভিযানে ৩৭ হাজার ২২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেবল মাদক বহনকারীদেরই নয়, মাদক সরবরাহকারী, অর্থলগ্নীকারী ও সিন্ডিকেট সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের কারাগার গুলোতে ৮৯ হাজার ৫৮৯ জন বন্দী রয়েছে। এর মধ্যে ৪২ ভাগ বন্দী মাদক অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে।

৪) ডোপ টেস্ট: সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অবৈধভাবে মাদক পাচারের চ্যানেল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাদকের সমস্যা হতে দেশকে রক্ষা করিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সরকার। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কলেজে ভর্তি ও চাকরিতে নিয়োগের পূর্বে ডোপ টেস্টের সুপারিশ করেছে। মাদক আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে, তাতে এই উদ্যোগ ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। তরুণ সমাজ, বিশেষ করে কলেজগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তরুণরা সহজেই একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। মাদকের মতো নেতিবাচক প্রভাব আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক নজরদারির পাশাপাশি ডোপ টেস্ট এখনই প্রচলন করা দরকার। ডোপ টেস্ট হল জৈবিক নমুনা-যেমন মূত্র, রক্ত, শ্বাস, ঘাম এবং মুখের তরল বা লালার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং এর সাহায্যে নির্দিষ্ট মাদক বা তার বিপাকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করা। ডোপ টেস্টের সাহায্যে সাধারণত খেলাধুলায় কর্মক্ষমতা বাড়ানো স্টেরয়েডগুলির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়; কোনো কোনো রাষ্ট্রে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, এমনকি পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট করানো হয়। নিষিদ্ধ মাদক, যেমন-গাঁজা, কোকেন, অ্যালকোহল, মেথামফিটামিন এবং হেরোইন ইত্যাদি গ্রহণ করলে ডোপ টেস্টে ধরা পড়ে।

মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে-প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গিকার

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে যুবসমাজকে ফিরিয়ে আনতে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজে অসুস্থতা দেখা যাচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, যুব সমাজ আজ নানাভাবে বিপথগামী হচ্ছে। তাদের যদি আমরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সক্রিয় রাখতে পারি, তাহলে দেশ থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে পারবো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেছেন, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস বা মাদকাসক্তি এগুলো মানুষের মন-মানসিকতা ও স্বাস্থ্য

নষ্ট করে দিচ্ছে, সমাজকে কলুষিত করে দিচ্ছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যাবসায়, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়নতা এবং দেশপ্রেম সৃষ্টি করে। আমরা তাদের যত বেশী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারবো তত বেশি তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকবে। কারণ একটা সুস্থ দেহ থাকলে সুস্থ মনও থাকবে। তখন তার এই মনটা আর এদিক সেদিক করবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৪৯০টি উপজেলায় "মিনি ষ্টেডিয়াম " নির্মাণের প্রকল্প করা হয়েছে 'সেখানে বার মাসই খেলাধুলা হতে পারবে' সম্পূর্ণ আলাদা মাঠে। যেন মানুষ চলতে ফিরতে খেলাধুলা দেখতে পারে। এই কথাগুলো প্রধানমন্ত্রী এমন সময়ই বললেন যখন বাংলাদেশের যুবসমাজের একটি অংশ আজ বিপথগামী। কেউ মাদকাসক্ত হয়ে জীবনকে ও পরিবারকে ধংস করে দিচ্ছে, অন্যদিকে কেউ জঙ্গি হয়ে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালোচ্ছ। এমন একটি সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থোক এই ধরনের বক্তব্য শুনে আজ অনেকেই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি নজর দিবেন আশা করি । আজ পরিবারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, বাবা মা উভয়ই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত । ছেলে মেয়েকে দেখভাল করার জন্য আছে কাজের লোক। টিউশন শেষ করে বাসায় ফিরে এলে তারা আবার ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের কম্পিউটার, ল্যাপটপ নিয়ে। তারা বাইরে নানা জায়গায় টিউশন নিতে যাচ্ছে। ফেসবুক অথবা মোবোইল নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ার অপসংস্কৃতির বলয়ে তারা ডুবে যাচ্ছে দিনের পর দিন। সেটা দেখবার বা বুঝবার মত লোক আজ পরিবারে যেমন নেই, তেমনি নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকাল মানবিক মূল্যবোধের অভাব। শিক্ষার চাইতে ডিগ্রি নেবার মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সুতারাং কোনো ছাত্র-ছাত্রী যদি ক্লাসে অমনোযোগী হয়, রেজাল্ট খারাপ করে, নিয়মিত অনুপস্থিত থাকে, তার খোঁজ নেবার মত নিয়মনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। তেমনিভাবে পরিবারের লোকজনও খেয়াল করেনা কেন তার ছেলে/মেয়েটি দেরিতে বাড়ি ফেরে অথবা রোজ রোজ এত টাকা কেন সে চায় ? অথবা তার রুমটি সারাক্ষণ বন্ধ থাকে কেন ? কেন সে নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঘোরা ফেরা করে কিংবা পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরাধের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হচ্ছে ঃ

১. মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা ।

২. মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা ।

৩. মাদক ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

৪. বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৫. স্কুল-কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা।

৬. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

আসুন, আমরা সবাই মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করি, তাদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযাগ করে দিই। তাহলেই তারা সমাজের বোঝা না হয়ে বরং সুস্থ হয়ে পরিবারে ফিরে আসবে। তারাই সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আর নতুনদের মাদকের ভয়াবহতা ও এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করি, সেই সাথে পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন অর্থাৎ তারাই হবেন সন্তানের আদর্শ।
বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবসে এই আমাদের প্রত্যাশা।

Role of Meditation and Yoga in Treatment of Substance Use Disorder

Prof. Dr. Mahadeb Chandra Mandal

Former Director, NIMH

Introduction:

Meditation and yoga are one of the treatment parts of management of substance used disorder (SUD). They are increasingly used by people with minor psychiatric problems like anxiety, depression, sleep problems and SUD. [1] It has been practicing throughout the world for years to years. Millions of people meditate in the United States, United Kingdom, India and other countries also, to reduce stress reduction and employee well-being. Meditation training of the patient, especially Yoga method by specialized trainer is helpful for the addictive patients as majority of them suffer from inner restlessness.

The word 'Yoga' is derived from the Sanskrit root 'Yuj', meaning to join or to unite. Yoga is a mind-body relaxation practice. Various types of yoga combine physical postures, breathing techniques, and meditation or relaxation with the objective of achieving a particular spiritual, psychological, or physiological goal.[2] Meditation is actually part of Yoga, being the higher state of consciousness. Meditation is performed after yoga when your body is filled with vibrations. Yoga is being considered as a holistic intervention inducing dopamine (DA) homeostasis leading to long-term benefits in managements of individual addictive behaviours. [3]

SUD is a multi-factorial disease which affects the addicted individuals in whole body, mind and spirituality. The cause of this disorder is bio-psycho-socio-spiritual factors. So, five essential treatment components of addictions (SUDs) are motivation, biological, psychological, social and spiritual therapy (Yoga, meditation, relaxation and religious therapy etc.) approach. The managements of a case of substance abusers are involved by a multidisciplinary team approach including psychiatrist, trained physician, psychologist, psychiatric social worker, trained nurses, counsellor, recovery drug addict, various types of therapists, occupational therapist and others allied professionals. Spirituality refers to the unique and intense experience of a reality greater than oneself or an experience of connection with the totality of things. [4] Meditation helps to gain stable conditions on both mind and body. It displays a greater connectivity of all regions of the brain as a result, raises brain levels of neurotransmitters called GABA (Gamma Amino Butyric Acid) which is shown to reduce stress and anxiety.

What is meditation?

Meditation is the method for voluntarily producing a state of consciousness distinct from both sleep and waking consciousness. It focuses the attention on a single object (such as your breath, a sound, or an image), thereby reducing awareness of all other external or internal stimuli to achieve a mentally clear and emotionally calm stable state. [5] The process of bringing your mind back to the object, again and again, causes able to pacify the mind and experience inner peace and joy. For example, when decide to meditate on your breath, try to be focus of every inspiration and expiration through nose and lung. In case of a mantra, Om mantra meditation or any kind of word that can be recalled repeatedly you mindfully recall the mantra thinking just behind in your forehead, or if it's an image, close your eyes and hold the image in your mind as vividly as you can. Meditation and yoga produce relaxation and regulation of breathing that directing attention away from external world to inner world that is from the stream of thoughts that would occupy the mind, often by repeating a any kind word or phrase (a mantra). Meditation offers increased self-awareness, a renewed spiritual religious connection, increased creativity, and a decrease in negative emotional responses to the stressful life. [1]

There are a various kind of meditations, like mindfulness (Buddhist meditation), focus, transcendental meditation (TM), mantra (om meditation), movement, sound, pranayama, spiritual etc. Among them there are two main types - concentrative meditation and mindfulness meditation.
Concentrative meditation concentration means one-pointedness of the mind on a specific object. When you concentrate, you focus your mind to remain solely on a single object without interruption. Mindfulness meditation is mainly the traditional Buddhist meditation practices. One of the main influencers for mindfulness in the west is John Kabat Zinn developed MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction program) in 1979 at the University of Massachusetts Medical School has been used in several hospitals. It is the practice of active focusing with fully aware of the present moment or what's happening non-judgementally paying attention to the sensations, thoughts and emotions that arise. You have to be pay attention to your thoughts as they pass through your mind. You don't judge the thoughts or become involved with them. You simply observe and take note of any patterns. When you're mindful, you are aware of your thoughts, emotions and feelings. These two types are occurring simultaneously at a time. This practice needs combine concentration with awareness. Concentration does the work of holding the mind steady on that chosen object. It is helpful to focus on your breath or an object while you observe any bodily sensations, thoughts, or feelings. Mindfulness picks your object of meditation and notices when the mind goes astray (slip off). So, mindfulness enables you to stay attentive and not get distracted by surrounding thoughts or images. If you get distracted, mindfulness helps you notice it. Then, you bring your mind back to the object of meditation and concentrate on it again accept thoughts without judgment or expectation. Every individual can easily be practiced alone without any teacher to guide.

In addition to this main type there is also have another western popular meditation named transcendental meditation that was founded by Maharishi Mahesh Yogi which is a simple, natural, effortless meditation technique practice for 15-20 minutes twice a day that does not need concentration or contemplation. This form of meditation allows your body and mind to settle into a state of profound rest, relaxation and to achieve a state of inner peace without concentration. In TM, need a comfortable place, and sit in a comfortable position that doesn't have to be in the lotus position. Whatever works for you is just fine. Choose any word or any language or a mantra (silently-used word) that has a significant meaning to you (or no meaning at all) should work. Start repeating the same word or mantra in your mind in a relaxed manner.

Breath as slowly and long as possible as time passes. The rhythm of your breath and your mantra should not necessarily match. Do this for as long as you want, start with 10-20 minutes. Do at least 10 minutes every day for improved mental health and wellbeing. It also helpful for better sleep and improve in anxiety or trait anxiety or depression. Neurologist have been found that practicing TM releases neurotransmitter, serotonin that affects your feelings of well-being and happiness. [7]

Procedure of meditation step by step:

There are many different ways to practice meditations, learning a basic meditation practice for beginners. It requires you to focus on your breathing.

Step 1- Select a quiet environment – to reduce external stimuli, remove all distractions from your room, turn off your mobile phone, television, and other distractions

Step 2- Sit a comfortable position - sit on the ground floor over a mat and cushion, with cross-legged (lotus or half-lotus yoga position), or you can kneel wearing a loose dress or on
a chair and have to comfortably for several minutes at a time. An appropriate posture induces a feeling of relaxation and away from distraction of cramped muscles that leads to relax.

Step 3 -Keep your head and back straight - your head, neck and back spine should be in a straight line from pelvis to neck and upright position that helps thinking.

Step 4 -Try to have a gentle smile - A breeze of calmness flows within you when you smile gently.

Step 5 - Keep eyes closed - practiced in a quiet location mouth close and closing eyes are kept lowered in whole process.

Step 6 - Focusing on breath slowly and deeply and attention on the base of the nose - take deep breaths and notice every slow inhalation using the diaphragm muscle to expand your lung taking more oxygen then pause for 5 seconds following slow exhalation so that you breathe more efficiently. Focus the mind all your attention on your every inhale for 10 counts, then hold your breath for 10 counts. Exhale for 10 counts and observe through the nose and lung. Repeat 5 times. Concentrate on feeling and listening sound as you inhale and exhale through actively your nostrils that helps impede the normal stream of consciousness. Inhale and tense your body, pause, relax and exhale.

Repeat 5 times. If a body part feels tight, consciously relax it. When a thought comes up, slowly return your focus to just you're breathing. Breathe deeply and slowly. That's the actual practice. Here some mental process (thoughts, emotions, memory, perceptions, motivations, dreams and beliefs) to direct the person's attention away from the external world and from stream of thoughts that would otherwise occupy his mind.

Step 7 - Eliminate distractions and notice your thoughts. The purpose of meditation is mind focus on gently bringing your attention back to your breath whenever you notice your thoughts drifting. Each time you inhale you count one number, starting with 10, and then moving backward to 9, 8, 7, etc. When you arrive at 1, you resume 10 to 1 back from again. If you get distracted and lose your count, gently return to back the attention to breath and to 10 and resume from there. Don't fight it immediately. Take your time. This technique is beneficial in keeping the mind focused on the breath. Keep your face relaxed eyes squeeze and jaw tightens up whenever lost in thoughts while meditating following face muscle relaxation. Don't judge yourself or obsess over the content of the thoughts you find yourself lost in. Just come back.

Step 8 - Set a time limit - about 5 to 10 minutes in length and 5-30 minutes twice a day in a convenient time. Smaller sessions are much better than a long (>30 minutes).

- Practice a relatively empty stomach - do meditate on a relatively empty stomach not after full lunch or dinner.

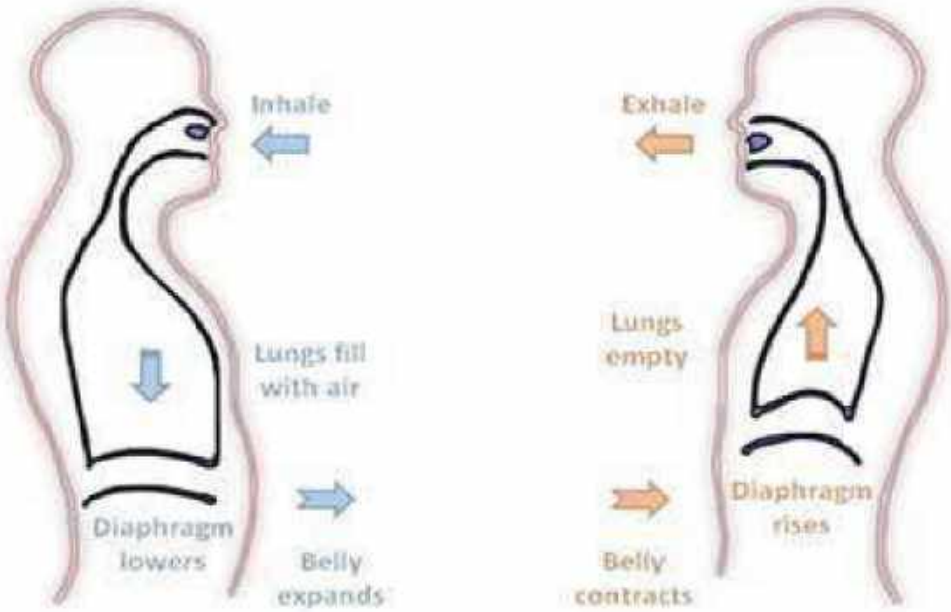

Fig. Do deep breathing exercises every day for 10 minutes

Deep breathing exercises aids in both physical and mental health by stress reduction, relapse prevention, increasing confidence, increased energy, regulation of body weight, balance heart rate, stronger lungs, improve mood, helping blood circulation throughout the body, and eliminates toxins.

So, start your meditation by taking

- several deep breaths. (breathing)
- focus on your breath (concentration).
- scan your body - take a moment to focus on each part of your body.

  Feel your body's various sensations from head to feet or feet to head where the pain, tension, calm, warmth and relaxation.

  Imagine and feel the breathing heat or relaxation into and out of different parts of your body (awareness of your body).
- Release tension, then walking meditation.
- evaluate your energy.
- reflect on the day
- think about what you can do for others.

The goal of these instructions is to keep your body muscles relaxed as calm as of mind.

Conclusion:

Yoga and meditation, which is a form of mind-body practice has been proven to reduce perceived stress, anxiety, improve physical, mental health and recovery of substance users with adjunct treatment of medical therapy. SUDs are a devastating, relapsing disease which affects the individual person's whole body, mind, spirituality and comparable to chronic medical illness with relapse rates of around 40% - 60%, which is comparable to relapse rate observed to diabetes mellitus type 1 (30% - 50%), hypertension and asthma (50% - 70% each). [8] It is important to find ways to heal all three of these systems like healing of mind, body and spirituality.

In Healing the Mind-Recovering addicts often have low self-esteem, prone to post cravings, depression and anxiety. There are a lot of things that you can do to help heal your mind after an addiction. You can improve your self-esteem, guilt feeling, shame, depression, anxiety, cravings by changing negative thoughts about yourself with medical treatment where necessary. Coping Skills is an important part of healing the mind is developing healthy coping skills. Coping skills are the tools that will help you deal with life's problems [9].

In healing the body - Body, mind and brain need time to heal from the addiction and adjust to life without substances. So, the individuals need proper nutrition, taking multivitamins, drinking plenty of water (men drink about 3 litres of water and women drink 2 litres of water a day).

Exercises release endorphins (body's natural morphine) from brain which make you feel good. They bind to the same receptors in the brain as pain medication, heroin and other opiates [10].

In Healing the Spirit - Spirituality can be an important part of life that often gradually become neglected in himself or by others while during addiction. It can be an important part of your recovery to heal your spiritual self. Attending regular self-services, doing regular meditation-relaxation and participating in religious activities, working to improve yourself and your life may help you heal your whole spirituality.

Watching television or documentaries in relation to spirituality may help to increase about spiritual activities. It is an ongoing process which you may work on over your entire lifetime [11].

References

1. Harrison P, Cohen P, Burns T, and Fazl M. Shorter Oxford Textbook of Psychiatry. 7th Edn. Oxford University press, United Kingdom. 2018, Oxford pp. 706-8.
2. https://www.medicalnewstoday.com › articles
3. Miller D, Miller M, Blum K, Badgaiyan RD, Febo M. Addiction treatment in America: After money or aftercare. J Reward Defic Syndr. 2015; 1:87-94.
4. Kurtz E, Ketcham K. The Spirituality of Imperfection: Modern Wisdom from Classic Stories. New York, NY: Bantam Books; 1992.
5. Andrew B. Crider, George R. Goethals, Robert D. Kavanaugh, Paul R. Solomon. Psychology. 4th edn. HarperCollinsCollegePublishers. USA. 1993:555-63.
6. Holzel, B.K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C. Mindfulness practice leads to increases in regional brain grey matter density, Psychiatry Research: Neuroimaging. 2011; 191(1): 36-43.
7. Journal of Neural Transmission.1976; 39: 257-267.
8. McLellan AT, Lews DC, O'Brien CP, Kleber HD, Drug dependence, a chronic medical illness: Implica tions for treatment, insurance, and outcomes evaluation. JAMA. 2000; 284:1689-95. [PubMed] [Google Scholar]
9. Exercise and Depression: Endorphins, Reducing Stress, and More. WebMD. WebMD. 2013;9:11.
10. Staff, Mayo Clinic. Water: How Much Should You Drink Every Day? Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical Education and Research. 2013;9.11.
11. Spirituality. Wikipedia. Wikimedia Foundation. 2013; 9:11.

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে শিল্পে ও অবৈধ মাদকদ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

মোঃ নজরুল ইসলাম সিকদার

অতিরিক্ত পরিচালক
এনএসআই

বহিঃ এবং অভ্যন্তরীণ যেকোন উপায়ে দেশের বিরুদ্ধে ঘটিতব্য বা সংঘটিত যুদ্ধ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা তথ্য চুরির ঘটনার মাধ্যমে সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করলে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এ সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অনেক সময় ঘটনার কারণ সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা বা জানার অনাগ্রহের কারণে অথবা ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অথবা ব্যক্তিগত লাভের জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাতে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম উপাদান হলো মানব নিরাপত্তা । ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'মানব নিরাপত্তা'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। ২০১২ সালের ২৫ অক্টোবর এ সংজ্ঞাকে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলন অনুমোদন করে। নিরাপত্তার ধারণাকে জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছে জাতিসংঘ। এসব ক্ষেত্র হচ্ছে- অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। এ সকল উপাদানের সাথে যেমন অর্থনীতির যোগ রয়েছে, তেমনি স্বাস্থ্যগত বিষয়ের সাথে অন্য সকল উপাদানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কারণ সুস্থ্য মস্তিস্ক ও সুস্বাস্থ্য ছাড়া অন্যান্য উপাদান সঠিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না।

জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোর মূলে রয়েছে নাগরিক নিরাপত্তা। নাগরিক নিরাপত্তার জন্যই রাষ্ট্র, সরকার ও রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ। এ নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত খাদ্য, বাসস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে ব্যক্তি নিরাপত্তা। আর সে কারণেই রাষ্ট্র সার্বভৌম। জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হলো শাসনব্যবস্থা ও নাগরিক নিরাপত্তা । নাগরিক নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের। আর সরকারের নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম হলো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী ও নজরদারি প্রতিষ্ঠান। শাসন ব্যবস্থা আর নাগরিক নিরাপত্তা (হিউম্যান সিকিউরিটি) জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নাগরিক নিরাপত্তার সঙ্গে সুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুসারে নাগরিক নিরাপত্তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মানবিক বিষয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক আঙ্গিক ইত্যাদি বিষয় জড়িত, যার মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় ।

বাংলাদেশে সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার বাস্তব বা ব্যবহারিক চর্চা হতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে চর্চা ও আলোচনা হয় শুধু দু-একটি প্রতিষ্ঠানে; তবে সেসব প্রতিষ্ঠানেও বেশিরভাগ সময় সার্বভৌমত্ব এবং কিছু অন্যান্য উপাদান নিয়েই চর্চা বা আলোচনা হয়। সে সব চর্চায় এখনও অপ্রচলিত নিরাপত্তা (নন-ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি বা এনটিএস) ঠিকমত স্থান পায়নি বা গুরুত্ব পায়নি। অপ্রচলিত নিরাপত্তার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হল, জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন বেসামরিক হুমকি (নন মিলিটারি থ্রেট), যেখানে ব্যক্তিনিরাপত্তার বিষয়টিও অন্যতম উপাদান।

আমাদের আলোচনার মুল বিষয় মাদক , অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য এবং যা কৌশলগত বাণিজ্যনীতি মেনে চলার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। কৌশলগত বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার আগে জানা দরকার কৌশল কি? কৌশলকে অনেকে বিভিন্নভাবে সজ্ঞায়িত করেছেন। থমসন ও স্ট্রিকল্যান্ড (২০০৩) এর মতে কৌশল হলো কতকগুলো প্রতিযোগিতামুলক কর্মকান্ড

ও ব্যবসায়ী দৃষ্টিভংগীর সংমিশ্রণে গঠিত কয়েকটি কার্যক্রম যা ব্যবস্থাপকগণ ক্রেতা সন্তুষ্টি, সফল প্রতিযোগিতা এবং সাংগঠনিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োগ করে। । [A strategy consists of the combination of competitive moves and business approaches that managers employ to please customers, compete successfully, and achieve organizational objectives.]

আরো অনেকে কৌশলকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা বা সংজ্ঞায়িত করেছেন।

বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় কৌশল হলো একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যার আলোকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সম্পদ ও প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে বহুপাক্ষিক স্বার্থ সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করা হয়।

তাহলে কৌশলগত বাণিজ্যনীতি বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কি এবং এটির প্রয়োজনই বা কি?

কৌশলগত বাণিজ্যনীতি বলতে বোঝায় এমন বাণিজ্যনীতি যা একটি বাস্তব বা সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক অলিগোপলিতে (যে ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা সীমিত কয়েকজন বিক্রেতা বা উৎপাদকের মধ্যে সীমিত থাকে) ফার্মগুলির মধ্যে কৌশলগত মিথস্ক্রিয়ার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। এ জন্যে দরকার কৌশলগত ব্যবস্থাপনা। আর কৌশলগত ব্যবস্থাপনা হল পদ্ধতিগত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং লভ্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ব্যবসার সুনির্দিষ্টতা নিশ্চিত এবং এর লক্ষ্য অর্জন করা ।

এটি কোম্পানির কৌশল মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং বাহ্যিক কারণগুলির পর্যালোচনা করে। এটি কোম্পানির মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং বাহ্যিক কারণগুলির একটি পর্যালোচনা, সম্পদ বরাদ্দকরণ, এবং প্রতিযোগিতা বিশ্লেষণ আইটেম সম্পর্কিত সফটওয়ার এবং প্রযুক্তি যা গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিকাশ, উৎপাদন, পরিচালনা, মজুদ বা অর্জনে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ কৌশলগত বাণিজ্য বলতে এমন বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে বুঝায় যেটি আইন মেনে সম্পন্ন করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা সঠিক না হলে বা কৌশলগত বাণিজ্যের আওতায় থাকা বস্তুর ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বা পরিণাম অথবা দুটোই বেশি হতে পারে।

একারণে এসকল বস্তু বা দ্রব্য সামগ্রীকে তালিকাভুক্ত দ্রব্যসামগ্রী বা সিডউল্ড আইটেম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এসকল কৌশলগত বস্তু বা দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সামরিক সরঞ্জামাদি, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ একই বস্তুর সঠিক এবং শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায় এবং সঠিক ব্যবহার না হলে ক্ষতি অনিবার্য। একে দ্বৈত ব্যবহার (ডুয়েল ইউজ বা ডাইভারসন) সম্ভব বস্তুও বলা হয়ে থাকে।

দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য বেসামরিক এবং সামরিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কতিপয় সিডিউল্ড উপাদান

কিছু ইলেকট্রনিক আইটেম, মেশিনের যন্ত্রপাতি, লেজার, ক্যামেরা, সংকর ধাতু, বিশেষ উপাদান, ক্রিপ্টোগ্রাফি সফটওয়্যার, কেমিক্যাল ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিছু ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী বা আইটেম এর আওতায় পড়ে। যেমন গল ব্লাডার ও কিডনি পাথর চিকিৎসায় (পাথর গুড়া করতে) ট্রিগারড স্পার্ক গ্যাপস যা লিথোট্রিপটারস এর উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয় এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ডেটোনেটর হিসেবে কাজে লাগে। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ মেডিকেল আইটেম অশান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। নিম্নে মেডিকেল ও নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ডেটোনেটর এর ব্যবহার দেখানো হলো-

চিত্র : Nuclear Dual-Use Example: Triggered Spark-Gaps

কেমিক্যালের দ্বৈত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যেমন ট্রাইইথানোলামাইন (Triethanolamine) । এটি শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের একটি সাধারণ উপাদান, যেমন: কসমেটিকস, শ্যাম্পু, লোশন, সেভিং ক্রিম, ডিটার্জেন্ট, পেইন্ট, কালি, অ্যামেচার ফটোগ্র্যাফি, ফার্মাসিটিক্যাল - ইয়ার ড্রপস ও নন স্টিকস স্যারফেস তৈরিতে এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। একই জিনিসের দ্বৈত ব্যবহার হতে পারে গণ বিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে। এটি রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশনে শিডিউল-৩ এ রাসায়নিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কারণ এটি মাস্টার্ড গ্যাস উৎপাদন করতে অপব্যবহার হতে পারে। এরূপ অনেক কেমিক্যাল আছে যার সাধারণ ও সামরিক ব্যবহার রয়েছে।

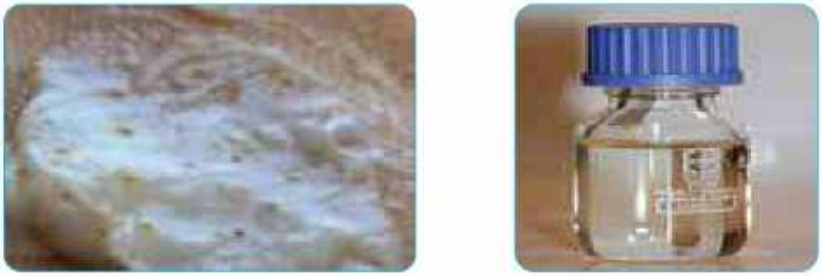

চিত্রঃ ট্রাইইথানলামাইন (Triethanolamine).

বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ও গার্মেন্টস কারখানায় ইউএনওডিসি'র তালিকাভুক্ত কেমিক্যাল বা রাসায়নিকসমূহের দ্বৈত ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, এফিড্রিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা (ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসেবে), নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া (কনজেস্ট্যান্ট হিসেবে), নারকোলেপসি, মাসিক সমস্যা (ডিসমেনোরিয়া) বা প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের সমস্যায় ব্যবহৃত ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে সর্দি, অ্যালার্জি, নাক বন্ধ উপশম করতে সিউডোএফিড্রিন ব্যবহার করা হয়। এটি সাইনাসের রক্তজমা এবং চাপ সাময়িক উপশম করতেও ব্যবহৃত হয়। সিউডোএফেড্রিন উপসর্গ উপশম করে। উভয় রাসায়নিক ইয়াবা, ক্রিস্টাল মেথ বা আইস এর মতো বিপজ্জনক মাদক এর উপাদান মেথামফিটামিন বা অ্যামফিটামিন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বিপজ্জনক অ্যামফিটামিন এবং মেথামফিটামিন বা এদের ডেরিভেটিভ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধভাবে চোরাচালান করা হচ্ছে।

Pseudo-ephedrine

Medical use : Pseudoephedrine hydrochloride pill.

Forbidden narcotic drug: Crystal meth

এরূপ আরও অনেক কেমিক্যাল বা রাসায়নিক বস্তু বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন যেগুলির ব্যবহার এবং অপব্যবহার দুটিই হতে পারে। তবে অপব্যবহারের আর্থিক লাভ বেশী হওয়ায় এসব নেতিবাচক কাজে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় ।

ইউএনওডিসি'র নিয়ন্ত্রণে ডাইভারসন হতে পারে এমন কেমিক্যালসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । বাংলাদেশে যে ৮/৯ টি সিডিউল্ড কেমিক্যাল বিভিন্ন শিল্পে (ওষুধ, গার্মেন্টস বা অন্যান্য শিল্পে) ব্যবহৃত হয় তার ক্ষেত্রে ইউএনওডিস'র অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য আমদানির অনুমতি গ্রহণ হতে শিল্পের চূড়ান্ত (ফাইনাল প্রোডাক্ট) উৎপাদন পর্যন্ত এসবের গতিবিধির উপর নজর রাখার নিয়ম রয়েছে । কারণ এসকল কেমিক্যাল এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যেমন উপকারী তেমনি অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বিপদজ্জনক এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো যিনি বা যারা এ বিষয়ে নজরদারি করেন তাদের এসকল কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু বা তাদের সে বিষয়ে পারদর্শী করে তোল হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে নজর দেয়া জরুরি। অন্যথায় উপকারী কেমিক্যাল ডাইভারসন হয়ে যেমন ক্ষতিকর মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি মারণাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে । আবার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট যেমন শান্তিপূর্ণ এবং জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি তা থেকে ডাইভারসন হয়ে ভয়াবহ মারণাস্ত্র তৈরির সহায়ক উপাদান হতে পারে। প্রয়োজনীয় ও শান্তিপূর্ণ আইটেম সন্ত্রাসবাদে ব্যবহৃত হতে পারে ।

ইউএনওডিসির আওতাধীন প্রায় ২৫- ২৬টি কেমিক্যাল রয়েছে যেগুলির ব্যবহার অনুমতি সাপেক্ষ । এর মধ্যে দু'একটি (সালফিউরিক এসিডসহ) বাংলাদেশে উৎপাদন সম্ভব বা উৎপাদিত হয়ে থাকে । বাকি সকল কেমিক্যাল ইউএনওডিসি'র আইএনসিবি এবং দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর অনুমতিক্রমে আমদানি করতে হয় । এরূপ অনেক পণ্য রয়েছে যেগুলোর সঠিক এবং ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা হতে পারে।

আলোচনার মুল বিষয় ছিল দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য কেমিক্যাল, মেডিকেল সামগ্রী, বা অন্যান্য ব্যবহার্য সিডউলড আইটেমের ব্যবহার যদি সঠিক না হয় তাহলে এর বিপদ কি বা জাতীয় নিরাপত্তায় এর নেতিবাচক প্রভাব কি ।

শুরুতেই যেমন বলা হয়েছে যে, মানব নিরাপত্তা হলো জাতীয় নিরাপত্তার মূল বিষয়। অননুমোদিত মাদক বা অন্যান্য ক্ষতিকর সকল উপদান মানব স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর । আবার অবৈধ মাদক আইন শৃংখলা বিনষ্টের কারণ। এতে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর আর্থিক লাভের বিষয় আছে। তবে সার্বিক মুল্যায়নে অবশ্যই আর্থিক ক্ষতির কারণ। অন্যদিকে এসবের অপব্যবহার আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশকে অকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিগণিত করার ঝুঁকি তৈরি হয়।

অতএব অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি-শৃংখলা এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার বিবেচনায় কৌশলগত বাণিজ্যনীতি মেনে কৌশলগত পণ্য সামগ্রির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

এজন্যে দরকার যে সকল সিডিউল্ড আইটেম রয়েছে সে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী ও নজরদারীতে জড়িত সংস্থার সদস্যদের সম্যক ধারণা দেয়া, নিয়ন্ত্রণের জন্য সততার সহিত দায়িত্ব পালন করা । আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই । শান্তিপূণ দেশ ও সমাজ চাই। এসডিজি এবং এমডিজি অর্জনের জন্য সরকার, জনগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা অনাকাংক্ষিত।

আবার আমরা দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য (ডাইভারশন সম্ভব) কেমিক্যাল বা অন্যান্য আইটেম এর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে সকল অর্জন বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কারণ অর্জনের মুল হাতিয়ার জনশক্তি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এসকল সিডিউল্ড আইটেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রতারকচক্র বা ফাঁদ তৈরির কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবসায়ী বা কোনো শোষক ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাছে যদি সাধারণ মানুষ জিম্মি হয় বা পুতুলের মতো ব্যবহৃত হতে থাকে, তাহলে বিজয়ের পরিবর্তে গ্লানি নেমে আসতে পারে। তেমনটি হলে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ধুলায় ভুলুণ্ঠিত হতে পারে । এ বিষয়ে রাজনৈতিক, নিয়ন্ত্রণকারী ও নজরদারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল সকলের সর্বোচ্চ সতর্কতা জ্ঞান ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

২২ নভেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ কার্যালয় (উত্তর) কর্তৃক খুলনা মহানগরীর বয়রা মুজগুন্নি এলাকায় অভিযান চালিয়ে নতুন মাদক লাইসারজিক এসিড ডাইইথাইল এমাইড (এলএসডি) উদ্ধারের চিত্র।

Falsified Medical Products Crime Prevention and Criminal Justice

Dr. Dulal Krishna Saha

Chief Chemical Examiner
Department of Narcotics Control

Falsified medical products pose a considerable public health threat as they can fail to cure, may harm and even kill patients. These threats to public health have led the international community to call for a stronger and more coordinated response. Compounding this public health risk is the fact that the supply chain for medicines operates at a global level, and therefore, a concerted effort at the international level is required to effectively detect and combat the introduction of falsified medical products along this supply chain.

The 20th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) adopted resolution 20/6 on falsified medical products due to concern about the involvement of organized crime in the trafficking in falsified medical products. At the same time, resolution 20/6 highlights the potential utility of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) for which UNODC is the guardian, in re-enforcing international cooperation in the fight against trafficking, though, its provisions, inter alia, on mutual legal assistance, extradition and the seizing, freezing and forfeiture of the instrumentalities and proceeds of crime.

As with other forms of crime, criminal groups use, to their advantage, gaps in legal and regulatory frameworks, weaknesses in capacity and the lack of resources of regulatory, enforcement and criminal

justice officials, as well as difficulties in international cooperation. At the same time, the prospect of the comparatively low risk of detection and prosecution in relation to the potential income make the production and trafficking in falsified medical products an attractive commodity to criminal groups, who conduct their activities with little regard to the physical and financial detriment, if not the exploitation, of others.

Resolution 20/6 contains nine action points among which paragraph nine requests that UNODC, in cooperation with other United Nations bodies and international organizations, such as the International Narcotics Control Board (INCB), the World Health Organization (WHO), the World Customs Organization (WCO) and the International Criminal Police Organization (ICPO/INTERPOL), as well as relevant regional organizations and mechanisms, national regulatory agencies for medicines and, where appropriate, the private sector, civil society organizations and professional associations, assist Member States in building capacity to disrupt and dismantle the organized criminal networks engaged in all stages of the illicit supply chain, in particular distribution and trafficking, to better utilize the experiences, technical expertise and resources of each organization and to create synergies with interested partners.While focus has been given to the health and regulatory aspect of this problem, it appears that less attention has been given to the issue from a criminal justice perspective. Given its expertise and work to build effective and transparent criminal justice systems and to support states to prevent and combat all forms of organized crime, UNODC can support the fight against the illicit manufacture and trafficking of falsified medical products in coordination with other stakeholders.

UNODC Guide to Good Legislative Practices on Combating Falsified Medical Product-Related Crime

UNODC published in 2020 a Guide to Good Legislative Practices on Combating Falsified Medical Product-Related Crime to support countries in enacting or strengthening domestic legislation in this area and in protecting public health.

UNODC developed the guide with financial support of France and contributions of numerous experts from all continents and of the Council of Europe, the Economic Community of West African States, the European Union, the International Council of Nurses, the International Criminal Police Organization (INTERPOL), the New Partnership for Africa's Development, the World Customs Organization and the World Health Organization. States can use the Guide as a practical tool as they draft, amend or review relevant national legislation. The guide uses the definition of falsified medical products adopted in 2017 by the World Health Assembly and does not distinguish between generic and originator products. It does not in any way deal with the protection of intellectual property rights but focuses on the protection of public health through a criminal justice response. It is hoped that this Guide will contribute to an increased number of national and international investigations and prosecutions of falsified medical product-related crime, which remains a "high profit low risk sector" for criminals.

Combating falsified medical product-related crime: a guide to good legislative practices
UNODC launches Guide to Combat Crime related to Falsified Medical Products
Technical Conference of Experts on the Trafficking in Fraudulent Medicines, 14-15 February 2013 in Vienna Report on the 20th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)Resolution 20/6.

The United Nations Office on Drugs and Crime and Terrorism Prevention

Terrorism continues to pose a major threat to international peace and security and undermines the core values of the United Nations. In addition to the devastating human cost of terrorism, in terms of lives lost or permanently altered, terrorist acts aim to destabilize governments and undermine economic and social development. Addressing this threat is that much more difficult given the complex and constantly evolving nature of terrorist activity. Its motivations, financing, methods of attack and choice of target are constantly changing. Terrorist acts often defy national borders; one act of terrorism can involve activities and actors from numerous countries. Given this complexity, strong coordination and cooperation within national governments and between states and organizations at the regional and international level is essential to effectively combat terrorism, to share best practices and lessons learned and to assist with the investigation and prosecution of terrorism cases.

In response to this threat, gradually over five decades of work, the international community has developed a common universal legal framework against terrorism. This framework is comprised of the **19 universal legal instruments against terrorism** along with the relevant United Nations Security Council Resolutions. The implementation of these conventions, protocols and resolutions is informed by the guidance provided by the UN Global Counter-Terrorism Strategy along with United Nations General Assembly Resolutions.
The Terrorism Prevention Branch (TPB) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has a specific role to play in these international efforts. For over a decade, TPB has been the key United Nations entity providing legal counter-terrorism technical assistance to Member States. As mandated by the United Nations General Assembly, TPB works to assist Member States, upon request, with the ratification, legislative incorporation and implementation of the universal legal framework against terrorism.

Within the United Nations system, UNODC possesses significant comparative advantages for offering a comprehensive response to terrorism. In particular, it combines a range of expertise in the related areas of crime prevention and criminal justice, rule of law, drug control, transnational organized crime, money-laundering, corruption and related international cooperation in criminal matters with operational field-level capacity.

Crime Prevention and Criminal Justice

UNODC has the mission of making the world safer from crime, drugs, and terrorism. To be effective and sustainable, responses to these threats must include strategies covering the following areas:

- Crime Prevention , especially Urban crime prevention; Youth-focused crime prevention; Armed violence prevention; Prevention of recidivism
- Criminal Justice Reform : Police reform, Prosecution service, Judiciary (the courts), Access to legal defense and legal aid, Prison reform and alternatives to imprisonment, and Restorative justice
- Justice for children; Support and assistance to victims; Gender in the criminal justice system Crime prevention and criminal justice strategies must be gender-responsive and respect the rule of law, therefore incorporating human rights law and principles. Acting as the custodian of the UN standards and norms in crime prevention and criminal justice, which promote human rights, UNODC assists Member States in reforming their criminal justice systems in order to be effective, fair and humane for the entire population. Within UNODC, the overall responsibility to assist countries in the areas of crime prevention and criminal justice lies within the Justice Section (Division for Operations at headquarters level). The Justice Section performs both normative and operational work. Its normative work relates to the revision of existing standards and norms, the development of new standards and norms, and the monitoring of their use and application. The operational work of the Justice Section includes activities such as providing technical assistance to Member States and developing tools to assist Members States in implementing the UN standards and norms.

At field level, UNODC has been developing regional/country programs covering all thematic areas included in its mandate, with strong crime prevention and criminal justice components based on needs and objectives identified in each region/country. For more information on UNODC's work on crime prevention and criminal justice at field level, please consult each field level entity's webpage on their crime prevention and criminal justice pillar through

UNODC's field offices portals.

UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice

The work of UNODC in crime prevention and criminal justice reform is guided by the UN standards and norms on crime prevention and criminal justice. The UN standards and norms are sets of non-binding rules, principles, and guidelines relating to different aspects of criminal justice, such as juvenile justice, violence against women, protecting the rights of children, and prison reform. Most of the UN standards and norms are resolutions adopted by the General Assembly or the Economic and Social Council.

Recent reports of the Secretary-General on use and application of UN standards and norms in crime prevention and criminal justice are also available.

Thematic Program and projects on Crime Prevention and Criminal Justice

The thematic program provides for the strategic framework for UNODC's work, especially that of the Justice Section, on crime prevention and criminal justice reform. It presents UNODC's mandate to assist countries in developing new instruments, strategies, policies and programs for crime prevention and criminal justice reform and presents the tools and services that UNODC can provide to States and non-State actors.The Thematic Program is implemented through a portfolio of UNODC projects around the world, most of which are part of UNODC regional and country programs. It is also implemented through UNODC's global project on crime prevention and criminal justice.

- **Thematic Program on Crime Prevention and Criminal Justice 2012-2015**
- **UNODC major achievements on Crime Prevention and Criminal Justice 2010-2011**
- **Global Projects on Crime Prevention and Criminal Justice 2012-2015 and its 2012 evaluation**

The global project aims at strengthening States' capacity to improve crime prevention and criminal justice systems in line with UN standards and norms and other relevant international instruments through (1) assessments, advice and program support to State policies and strategies; (2) tools development and training, also to support State policies and strategies; (3) standards and norms development or update. The project is implemented with a strong focus on partnerships with other UN agencies and international NGOs.

Statistics and Surveys

Apart from normative and operational work, UNODC also conducts research in the areas of crime prevention and criminal justice.

Crime statistics: see, for instance, the world crime trend reports here

- **Crime victimization surveys (CVS)**
- **United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems**
- Tenth Survey on Capital Punishment and on the implementation of the safeguards guaranteeing the protection of the rights of those facing the death penalty, covering the period 2014-2018 - UNODC's contribution to addressing the global prison crisis, presentation by the Justice Section, 20 January 2014. At field level, UNODC has been developing regional/country programs covering all thematic areas included in its mandate, with strong crime prevention and criminal justice components based on needs and objectives identified in each region/country. For more information on UNODC's work on crime prevention and criminal justice at field level, please consult each field level entity's webpage on their crime prevention and criminal justice pillar through **UNODC's field offices portals.**

In order to bring criminals to justice, police and prosecutors need evidence. Guilt or innocence can be proven through physical traces discovered and examined by forensic experts - like fingerprints, hair sample or DNA. Drugs also have their own signature. Their composition can reveal where they came from, what they are made up of, and their potency. This is vital for understanding drug trends, in bringing evidence from the crime scene to the court room and addressing health. **UNODC, through its Laboratory and Scientific Section,** aims to: Improve the national forensic capacity and capabilities of Member States to meet internationally accepted standards; ensure the worldwide availability and accessibility of internationally accepted standards; Increase the use of forensic science services, data and information for evidence-based operational purposes, strategic interventions and policy and decision-making.

Reference:

1. The Use Of Information And Communications Technologies For Criminal Purposes, Submitted To The 74th Session Of The General Assembly.

2. Group of 77 Workshop on Preventing And Combatting Cybercrime, Supported By The Russian Federation And UNODC.

3. UNODC launches Guide to Combat Crime related to Falsified Medical Products.

4. Technical Conference of Experts on the Trafficking in Fraudulent Medicines.

5. Tenth Survey on Capital Punishment and on the implementation of the safeguards guaranteeing the protection of the rights of those facing the death penalty, covering the period 2014-2019.

তারুণ্য ও মাদকাসক্তি

মোঃ আহসানুর রহমান

উপপরিচালক (অপারেশন্স)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকাসক্তি বা মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে তাবৎ দুনিয়ার সর্বত্রই কম-বেশি আলোচিত হচ্ছে। ঘর-গৃহস্থালী কিংবা চায়ের দোকান হতে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, এমনকি পার্লামেন্টে পর্যন্ত। এই সমস্যা দূর করার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন/প্রটোকল রয়েছে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং ও এর গতি-প্রকৃতি নির্ধারণসহ মাদক সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য ৩ টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রণীত হয়েছে। তরুণরাই/যুবসমাজই মাদকের করাল গ্রাসে সবচেয়ে বেশী নিপতিত হচ্ছে । যে ফ্যাক্টরগুলো তরুণদের মাদকাসক্তির জন্য দায়ী তার মধ্যে অন্যতম ফ্যাক্টর হচ্ছে-(১) বন্ধুদের প্ররোচনা (Peer pressure): (২) মাদকের প্রতি কৌতুহল ও (৩) পরিবেশ ।

বন্ধুদের প্ররোচনা (Peer pressure)

বন্ধু, সহকর্মী অথবা সহপাঠিদের (Peer pressure) মধ্যে সম্পর্ক আমাদের সমাজ জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পানি বিহীন মাছ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি বন্ধু বিহীন জীবনও কল্পনা করা যায় না। তবে এই সম্পর্কের নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় প্রকারের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। দেখা গেছে একজন ভালো বন্ধুর সংস্পর্শে এসে পথভ্রষ্ট আরেক বন্ধু তার জীবন পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। একজন ভালো ছাত্র, পিতা-মাতার বাধ্য, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এমন একটি ছেলের সাথে তার সহপাঠি যদি সখ্যতা গড়ে তুলে, সেখানে ভালো কিছু আশা করা যায়। অপরদিকে খারাপ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে জীবন অথৈই তিমিরে ডুবে যাওয়ার আশংকাই বেশি। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়-একজন ধূমপায়ীর সাথে বন্ধুত্ব করলে ধূমপায়ী হওয়ার সমূহ ঝুঁকি থেকে যায়। এরপর বাড়তি উপদ্রবও তার অজান্তে দৈনন্দিন কাজেকর্মে ও অভ্যাস প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এ বিষয়ে রাসূল (সঃ) এর একটি হাদিস থেকে জানা যায়- একজন আতর ব্যবসায়ীর সাথে সখ্যতা গড়ায় তার কাছে আতর না পাওয়া গেলেও ঐ দোকানে প্রবেশ করার সাথে সাথে আতরের গন্ধ তার সাথে লেগে যায়। অপরদিকে একজন কামারের সাথে বন্ধুত্ব করায় কামারের হাপরের ধোঁয়া ও ছাইয়ের কণা তার শরীরে লেগে যায়। তাহলে বিষয়টি নির্ভর করছে বন্ধু নির্বাচন করার উপর।

অনেক সময় সঠিক বন্ধু নির্বাচন করা দূরুহ। এটা একটি সহজাত প্রকৃতি, কখন কার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে তাও আগাম জানান দিয়ে বলা মুশকিল। এছাড়া মানব মন অনেকটা জটিল। এর গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করা অনেকটা সমুদ্রের ঢেউ গণনার মতো। কেউ বলেছেন-আকাশের রং ও মানুষের মন কখন বদলায় তা বলা যায় না। আবার কেউ বলেছেন- মানুষ অচেনা অন্ধকার। আসলেই মানব মন এক অজানা রহস্যে ঘেরা ও অদ্ভুত প্রকৃতির। তবে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর মনের অবস্থার পরিবর্তন অর্নিবার্যভাবে ঘটে থাকে। আর এই মনের উপর যখন চলে মাদকের আধিপত্য, তখন মানব সত্ত্বা দানব সত্ত্বায় পরিণত হয়। এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। কারণ Relapse নামক শত্রুটি তার brains এর গহীন কোণে বসবাসরত Receptor কে মাদক গ্রহণে মরিয়া হয়ে অনুক্ষণ আহবান জানায়। সে তখন এই আহবানে সাড়া না দিয়ে পারে না।

এই এজন্যই অভিজ্ঞরা বলে থাকেন 'Drug addiction is treatable and manageable disease but not curable'.

এ পর্যন্ত যত মাদকের আবির্ভাব দুনিয়ায় ঘটেছে, তার (৮০-৯০)% মাদক হচ্ছে মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মাদকদ্রব্য Psychotropic Substance। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ১ম তফসিলে যত মাদকদ্রব্যের নাম রয়েছে তার অধিকাংশই হচ্ছে- Psychotropic Substance। মানব শিশু তার জন্মলগ্ন হতেই কতগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা (Traits and Characteristics) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । এগুলোর কিছু আছে অভিন্ন এবং কিছু আছে অন্যন্য (Unique)। শিশুরা বংশ পরম্পরায় জিনগত কারণেই এ বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে থাকে। তবে জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি শিশু যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে সে পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তার শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিপক্কতা বা রূপ পরিগ্রহ করে। এই বিষয়ে মহানবী (সঃ) বলেছেন- প্রতিটি মানব শিশুই তার নিজ ফিতরাতের (Traits and Characters) উপর জন্ম গ্রহণ করে, পরে তার পিতা-মাতার ধর্ম, অভ্যাস, আদর্শ ও পরিবেশের উপর তার জীবন বিকশিত হয়।

মাদকের প্রতি কৌতুহল

কিশোর / তরুণ বয়সে অজানা বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকে প্রবল। সেক্ষেত্রে বিষয়টি যদি Social taboo বা নিষিদ্ধ কোনো জিনিস হয়। আর যদি নিকট বন্ধু বা অতি কাছের মানুষের কাছ থেকে কোনো অফার বা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আসে, সেখানে প্রথমবারের মতো চেখে দেখার (experiment) দুর্নিবার শক্তি (Impulsive force) তার শরীর ও মনের উপর প্রভাব ফেলে। এর উপর যদি কোনো কিছুতে লোভনীয় এবং শক্তি-সামর্থ প্রদর্শনের কোন fasination থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। তার সমূহ সম্ভাবনা থাকে উক্ত আহবানে সাড়া দেয়ার। কারণ কিশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে জীবনের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ঝুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতির। কিন্তু আবেগ, প্রেষণা ও এডভেঞ্চার থাকে অমিত ও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণহীন। স্রোতের অনুকূলে গা-ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এ বয়সে প্রচ্ছন্ন আবেগ এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করা সবার জন্য সহজ হয় না।

মাদক সম্পর্কে অনেক কল্পকাহিনী (myth) সমাজে প্রচলিত আছে যেগুলি বন্ধুদের দ্বারা অনেক সময় সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণ যুবাদের কাছে চলে আসে। এখন তো অন-লাইন, ডিজিটালের যুগ, সীমাহীন তথ্য উপাত্তের সমারোহ, মুঠো ফোনের বদৌলতে হাতের নাগালে প্রায় সবকিছু। কোনটা myth আর কোনটা Real তা যাচাই করার সুযোগ কোথায়? আর কিশোর তরুণদের বেলায় বিষয়টি আরও স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। মাদক সম্পর্কে অনেক myth আছে, তাৎক্ষণিক সুখ-ভোগের হাতছানি, শক্তি বর্ধক, গ্লামার, ফ্যাশান, ইত্যাদি সংক্রান্ত ভুল বার্তা কিশোর তরুণদের কৌতুহলী ও উদ্দীপ্ত করে। ফলে দুর্বল চিত্তের অধিকারী তরুণ-তরুণীরা বন্ধুর মাদকের অফারকে গ্রহণ করে। একদিন কোনো এক নিরিবিলি পরিবেশে অতি সন্তর্পনে একটি সিগারেটে টান দেয়। আস্তে আস্তে গাঁজার এক পুরিয়া সিগারেটের খোলসে পুরে টান দেয়। সাময়িক সুখ-সুখ ভাবের সুড়সুড়ি তাকে টেনে নিয়ে যায় হেরোইনের দিকে। ক্রমান্বয়ে আরও কঠিন ড্রাগসের দিকে সে অগ্রসর হয়। বিষয়টি মাছ ধরার বড়শির (hook) মতো, একবার কেউ মাদকের এই বড়শীতে আটকে গেলে, ফিরে আসা কঠিন। অনেকটা অসম্ভবও বটে!

পরিবেশের প্রভাব

শিশু কিশোর যুবা-প্রবীণ এক কথায় আমরা সবাই প্রতিনিয়ত নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখী হচ্ছি। সেখানে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিতে বা নিতে হয়। এখন যিনি সিদ্ধান্ত দেন তিনি হন লিডার আর যিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি হন অনুসারী। উদাহরণ স্বরুপ বলা

যায়- নিজের পোশাক কেনা-কাটা, চুল কাটা ইত্যাদি হতে শুরু করে সকল কাজেই হয় নিজের মত অনুযায়ী অথবা অন্যকে অনুসরণ করে আমরা কাজটা করে থাকি।

এক্ষেত্রে দেখা গেছে অধিকাংশ মানুষই অন্যকে অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু যেটা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সবকিছুর জন্যই ক্ষতিকর সেটা অনুসরণ করা অনুচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সেটা পারিনা। ধরুন কোনো এক পার্টিতে বা কোনো জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ঘণিষ্ঠ বন্ধুরা একত্রিত হলো। আনন্দ ফূর্তির কোনো এক মোহনীয় ক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী এক বন্ধু অফার করলো অ্যালকোহল পান বা ইয়াবা সেবনের। তখন আনন্দঘন ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ মুহূর্তে 'না' বলা সবার জন্যই কী সহজ? ঐ মুহূর্তে 'না' বলতে শুধু তারাই পারে, যাদের আত্ম-মর্যাদা (Self-esteem) অটুট ও নিজস্ব স্বকীয়তায় অনন্য। তারাই গড্ডলিকা প্রবাহে হরিয়ে যায় না।

(ক) মাদকে 'না' বলা কাজটি অতো সহজ নয়। মাদক প্রতিরোধে না-বোধক উচ্চারণও উচ্চ-কণ্ঠ করতে আমাদের কিশোর/তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভালো কাজের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে।

(খ) মাদক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সারা দেশে Faith-based কর্মসূচি চালু করতে হবে। এলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সারাদেশের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মসজিদের ইমাম/খতিবকে প্রধান করে মসজিদভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, কর্পোরেট কালচার ও ফ্লাট কালচারের কৃত্রিম লৌকিকতা, মানসিক দাসত্ব ও চিন্তার দেউলিয়াপনা ইত্যাদির উপদ্রব আমাদেরকে প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্য ঘেরা নিয়ামত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং মহান আলাহ তায়ালার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়ে অজানা মানবিক সংকটের দিকে বিশ্ব মানবতাকে ঠেলে দিচ্ছে। আগামী প্রজন্ম তথা বিশ্ব মানবতাকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার এখনই সময়।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক ফেন্সিডিল (কোডিন মিশ্রিত সিরাপ) আটকের চিত্র।

Drug Prevention Interventions in Bangladesh

Md. Manjurul Islam

Deputy Director
Department of Narcotics Control

The present government is determined to build a drug free Bangladesh. In the age of modern information technology, drug traffickers continue to smuggle and trade new types of drugs by adopting new methods. The strategy of the drug business is constantly changing. The new drug aggression and the involvement of people of different classes and professions in the drug business are making the situation worse.In order to protect the youth and the nation from the scourge of drugs, it is necessary to organize anti-drug social awareness and to conduct a joint operation against drug traffickers by all law enforcement agencies including the Department of Narcotics Control. The Department of Narcotics Control is continuing its efforts as the nodal agency to implement the government's 'Zero Tolerance' against drugs.

To implement the government's 'Zero Tolerance' against drugs, Department of Narcotics Control (DNC), Bangladesh had been cooperating with 12 ministries, including the Ministry of Education, to provide preventive drug education to adolescents nationwide. Preventive drug education activities including exhibition of short film, Debate, Essay writing and Art competition, Human chain, seminar etc had been organized at every School, College, university and other educational institutions. Anti drug leaflets, posters and scales have been distributed among the students to counter the non medical use of drugs. Anti drug committee had been formed 31080 educational institutions in Bangladesh. Department of Narcotics control issued license to non-governmental organizations, work jointly on prevention education among young people. DNC also issued license for Drug Addiction treatment centre to provide treatment and rehabilitation programs. DNC continued to provide and promote preventive education by setting up LED and Kiosk in the most vulnerable area for drug addiction and gathering places of mass people.

Department of Narcotics Control (DNC), Bangladesh cooperated with Govt. and non-governmental organizations by arranging anti-drugs training courses for Imam of Mosques, social workers, teachers, Police, BGB, Coast Guard, customs officers and medical staff and advocacy training program for the community leaders. Those courses included: how to cooperate by sharing information with law enforcers about drug trafficking, how to identify adolescents, young people who had drug abuse problems; improving motivation among drug addicts to quit drugs; and enhancing drug treatment and rehabilitation counseling skills.

Department of Narcotics Control (DNC), Bangladesh and national Curriculum Board jointly added a special chapter covering the drug menace in the text book for the students of school. In addition, the DNC regularly conducted lectures and seminars for students, from primary school to tertiary level.

A meeting for exchange of views was held between the Security Services Division of Ministry of Home Affairs and the Department of Health Services on 19 November 2018 on issues related to the development, expansion of medical services for drug addicts in the country, supervision of private treatment centers and other issues.

The committee formed at the meeting has recommended bringing the drug addicts across the country under the treatment using the existing health care department infrastructure in the country.

According to the statistics of the National Institute of Mental Health, the number of drug addicts in the country is 3.6 million which is a matter of great concern for the country and the nation. According to the statistics of patients admitted for treatment in various rehab centers for the treatment of drug addicts, 85 percent of the drug addicts in the country are youth. Bringing this large number of people back into the mainstream of society with the necessary medical care is a major challenge for the government.

At present there are about 5 lakh drug cases in different levels of courts in Bangladesh. In all these cases, the real drug dealers are accused of being drug dealers and only drug users. But according to the World Health Organization, drug addiction is a treatable physical and brain related disorder. If drug addicts can be brought under treatment, the number of drug addicts in the country and the number of cases in the courts will be greatly reduced, the number of detainees in prisons, the proliferation of illicit drug trade and social violence will be reduced and the law and order situation will improve.

The government has four 199-bed rehabilitation centers in Bangladesh for the treatment of a large number of drug addicts which is absolutely inadequate compared to patients. Besides, there are 361 privately licensed drug addiction treatment centers with 4851 beds. According to a statistic, in the last 10 years (from 2011 to 2020), the number of drug addicts treated in public and private treatment centers was 2,20,849. With this rate of treatment, it will take a long time to bring 36 lakh drug addicts under treatment.

Psychological methods based on different thoughts and behaviors play a special role in the treatment of drug addicts as well as medicine. The role of psychiatrists and psychologists in this case is immense. However, as their number is very low in the country, it is not possible to ensure the treatment of drug addicts in the grassroots level treatment centers. In this case, it is possible to spread the treatment of drug addicts to the grassroots level by ensuring proper use of the existing medical structure and manpower of he country.

Department of Narcotics Control (DNC) recently formulated Comprehensive Action Plan (CAP) to wipe out the abuse of illegal drugs. This Comprehensive Action Plan (CAP)has been formulated due to the following decisions:

- Decisions taken at the inter-ministerial meeting to implement the 'Zero Tolerance' policy against drug offence declared in the 2018 election manifesto of the present government.
- According to the decision of the meeting held in the Cabinet Division on 18 August 2021, identification of drug offenders and identification of drug routes through real time information sharing and conducting operations.
- In order to implement the present government's commitment to create opportunities for treatment by identifying drug addicts and determining the level of treatment through Service at the door steps.
- Finalizing Action plan by conducting workshops with concerned persons at division, district and upazila level for implementation of the above activities and monitoring through Apps.

Aim & Objectives of the CAP

- To create mass awareness among people of all walks of life across the country and to build strong social movement / resistance against drugs.
- Creation of anti-drug attitude among all including students.
- Organizing concerned citizens against Drugs to raise voice against drug offenders.
- To identify drug traffickers and take strict legal action to reduce their social influence and prestige.
- Identifying drug addicts across the country and providing treatment.
- To take initiative to control drug crime through mutual communication and coordination of all government and non-government officials and employees.
- To build drug free Bangladesh with the participation of people of all classes and professions.

Action plan to reduce drug demand:

Ward will be the minimum unit for drug reduction activities at field level. Throughout the year, each ward will be involved in one or more anti-drug activity. The person nominated by the Ward Councilor/Member/ Union Parishad Chairman or the concerned government or non-government official worked in a word will be in charge of implementing the anti-drug action plan in a word and at the end of each program implementing entity submit the details to Union Parishad Chairman. The Chairman of the Union Parishad will submit the details of the events to the Upazila Nirbahi Officer through apps. The person nominated by the Chairman of the Union Parishad shall send to the Upazila Nirbahi Officer or his nominee comprehensive information of all the public awareness activities of the said

Union in the information table of the Union. Similarly, the Upazila Nirbahi Officer or his nominee shall send to the Deputy Commissioner or his nominee as per the information table of the upazila the comprehensive information of mass awareness activities of all the unions of the said upazila. Month, date and time will be specified for implementation of anti-drug public awareness activities at ward level. At the Union, Upazila and District level, the information of the total implemented programs on monthly basis should be included in the prescribed table.

Action plan to reduce drug supply:

In the age of modern information technology, drug traffickers continue to smuggle and trade new types of drugs by adopting new methods. The strategy of the drug business is constantly changing. The new drug aggression as well as the involvement of people of different classes and professions in the drug business is making the situation worse.

In order to protect the youth and the nation from the scourge of drugs, a joint operation is being conducted against drug traffickers and traffickers by all the law enforcement agencies including the Department of Narcotics Control.To this end, the following topics have been outlined and procedures have been developed in the Comprehensive Action Plan (CAP) which will be monitored through apps.

- Drug spot identification
- Drug smuggling route identification

Action plan relating to harm reduction:

According to SDG 3.5.1, the Department of Narcotics Control is functioning under the Security Services of the Ministry of Home Affairs as the lead ministry which is responsible for the treatment of drug addicts. It is important to bring a large number of drug addicts back into the mainstream of society through treatment. But due to lack of adequate professional manpower and infrastructural facilities for the treatment of drug addicts, the medical activities are being severely hampered.For this, in the action plan, activities have been taken from the community level for the treatment of drug addicts.For this, in the Comprehensive Action Plan, following activities have been taken from the community level for the

treatment of drug addicts:

- Identifying drug use diseases at the community level
- Providing first aid subject to mild, moderate and severe drug addiction assessment
- Divide into four stages, namely, community, primary, secondary and tertiary; first aid, refer ral, specialist treatment, relapse prevention, rehabilitation process need to be provided.

It is possible to build a drug free Bangladesh through creation and implementation of need based plan at the institutional level in each ward through interaction and coordination among the concerned ministries, Department of Narcotics control department, various law enforcement agencies, local administration, judiciary, health department, government and non-government organizations involved in drug demand, supply and harm reduction activities.

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধে তরুণ সমাজ ও পরিবহণ মালিক-শ্রমিকের ভূমিকা

মোঃ মানজুরুল ইসলাম

উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বিশ্বজনীন সমস্যাসমূহের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি মারাত্মক সমস্যা। এটি সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি চরম অভিশাপ। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এর কালো থাবা বিস্তৃত। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম যেকোনো দেশে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। যার ফলে দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। জাতীয় অর্থনীতি ও সুষ্ঠু সামাজিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ হচ্ছে বিপথগামী। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতার পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদক সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয়। এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মাদক উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক বলয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট-পাকিস্থান, আফগানিস্তান ও ইরান; দক্ষিণ -পূর্বে অবস্থিত গোল্ডেন ট্রায়াংগেল -থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওস । এই বৃহৎ দুই মাদক বলয়ের কারণে বাংলাদেশ ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার দিন দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মাদক সমস্যা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের তিন দিক দিয়ে ভারতের সাথে ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ পূর্ব কোনে মিয়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থল সীমান্ত আরো একটি ভৌগোলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ২০১৩ সালের সার্ভে অনুসারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২১৬৪২.১৯৯ কিলোমিটার হাইওয়ে রয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে মূলতঃ হাইওয়েতে চলাচলকারী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, রেলপথে এবং নৌপথে-পণ্যবাহী ট্রলার, লঞ্চ, স্টীমার, মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারের মাধ্যমে মাদক এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাচার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ৩ টি কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে:

ক) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)ঃ বাংলাদেশে সীমান্ত দিয়ে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি ও কোস্ট গার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকৃত অবৈধ মাদক উদ্ধার এবং অপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচারের সন্মুখীন করার কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, কাস্টমস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর মাদকের সরবরাহ হ্রাসে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১) দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহপূর্বক, মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, তল্লাশী, গ্রেফতার, অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, মামলা রুজু, রুজুকৃত মামলার তদন্ত, সাক্ষ্যদান এবং বিচার কার্য পরিচালনা। মামলার রায় ঘোষনা হওয়ার পর মাদক ও মাদক জাতীয় দ্রব্য বিণষ্ট করার কার্যক্রমও পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছে।

২) লাইসেন্স, পারমিট প্রদান পূর্বক বৈধ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

৩) দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধর করছে।

৪) UNODC, INCB, SAARC, Colombo Plan সহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ, মাদক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় ও কাজের সমন্বয় সাধন করছে।

খ) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)ঃ পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পর্যায়ে .মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষের বিবেক, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে মাদকের চাহিদা হ্রাস করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

- আলোচানা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, শ্রেণি বক্তৃতা, মত বিনিময়, মাইকিং এর মাধ্যমে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষের মাঝে তুলে ধরা হচ্ছে।
- মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনসমূহ নিবন্ধিত করে তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে।
- মাদকবিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, বুলেটিন, স্যুভেনির, পুস্তিকা, গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুতকরে জনসাধারনের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আয়োজন করে জনগনকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।
- ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)ঃ মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বহুমূখী কাজ করছে।
- মাদকাসক্তদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের তালিকাভূক্ত করে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার মধ্যে এনে এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করছে এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে।
- Detoxification , OST Program তত্ত্বাবধান করছে।

বাংলাদেশে নারকোটিক ড্রাগস পরিচিতিঃ

নারকোটিক শব্দের অর্থ ঘুম বা অবসাদ উৎপাদনকারী। নারকোটিক জাতীয় মাদকদ্রব্য বলতে বুঝায় যা ঘুম বা অবসাদ উৎপাদন করে এবং চৈতন্যের বিলোপ ঘটায়। এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলোঃ

- ব্যবহারকারীর মধ্যে এক ধরনের শারিরীক ও মানসিক নির্ভরশীলতা তৈরি করে যা ব্যবহারকারীকে বশ করে ফেলে
- ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আসক্তি উৎপাদন করে
- শরীরের উপর ক্রমাগত অধিক মাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা বা সহনশীলতার জন্ম দেয়

- ব্যবহারকারীর শরীরে প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া ঘটায় বা কখনও জীবন সংহারক রূপ ধারণ করে
- ব্যবহারকারীকে শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিকভাবে পঙ্গু করে দেয়।

প্রকার ও প্রকৃতিঃ

- অপিয়ডস যা ঘুম উৎপাদনকারী, বেদনানাশক, অবসাদ সৃষ্টিকারী- আফিম, হেরোইন, কোডিন ফেনসিডিল, কোরেক্স এসকাফ ইত্যাদি), পেথিডিন, মরফিন, মেথাডন ইত্যাদি
- স্টিমুল্যান্টস বা উত্তেজক-কোকেন, মেথামফিটামিন (ইয়াবা) ইত্যাদি
- সিডেটিভ, হিপনোটিক ও ট্রাংকুলাইজার-বেনজোডায়াজিপাইনস বা ভ্যালিয়াম, ল্যাব্রিয়াম, অ্যাটিভান, সিডাকসিন, বারবিচুরেটস, নেমবুটাল, টুইনাল ইত্যাদি
- হ্যালুসিনোজেনস বা মনোবৈকল্য ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী- গাঁজা, লাইসারজিক এসিড ডাই ইথাইল এমাইড (এলএসডি), সাইলোসাইবিন (ম্যাজিক মাশরুম), ফেনসাইক্লিডাইন, ডাইমিথক্সি ব্রোমো এ্যামফিটামিন (ডিওবি) ইত্যাদি

মাদক ও তরুণ সমাজঃ

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধি ধীরে ধীরে বিবর্ণ করে দিচ্ছে আমাদের সবুজ তারুণ্যকে, নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশের রয়েছে পর্যাপ্ত তারুণ্য নির্ভর জনশক্তি। দেশের এ মুল্যাবান সম্পদ মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের কবলে পড়ে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি দেশের অর্থনীতি যেমন বিপর্যস্ত হয়, উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। নেশার ছোবলে পড়ে এ যুবসমাজ কর্মশক্তি, সেবার মনোভাব ও সৃজনশীলতা হারিয়ে দেশ ও জাতির অপূরনীয় ক্ষতি সাধন করছে। এইচআইভি এইডস সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যধি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

নেশায় অভ্যস্ত হবার পর জগতের সমস্ত সুন্দর চিন্তা মাথা হতে অপসৃত হয়ে যায়। যে কিশোর বা তরুণটি ছিল শান্ত-সুবোধ সেই হয়ে ওঠে অপরাধ প্রবণ। শহরাঞ্চলে যত ছিনতাই রাহাজানি ঘটে তার অধিকাংশই হয়ে থাকে নেশাগ্রস্থ তরুণ-কিশোরদের দ্বারা। নেশার টাকা যোগাড় করতে গিয়ে তারা চুরি ছিনতাইয়ের মতো অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তরুণ সমাজের মধ্যে মাদক গ্রহণের আকর্ষণই যথেষ্ট। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশরা চীনে আফিম আমদানি করে চীনা জাতিকে আফিমে আসক্ত করে ফেলেছিল। তখন চীনের ছেলে, বুড়ো-বুড়ি সবাই আফিম সেবন করে বুঁদ হয়ে থাকত। মাদকাসক্তির কুফল চীনাদের নিকট স্পষ্ট হওয়ার পর চীনের সঙ্গে বৃটিশদের বিরোধ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের সঙ্গে চীন যুদ্ধে লিপ্ত হয় যা আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এখন চীনারা আফিমমুক্ত এক বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

মাদক প্রতিরোধে তরুণ সমাজের করণীয়ঃ

১) তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা ক্রমবিলুপ্তির পথে। ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে অশুভ শক্তির বিকাশ ঘটছে এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে আসছে মাদকাসক্তি। সৃষ্টি হচ্ছে মাদকের সর্বগ্রাসী চাহিদা। তরুণদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চেলে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

২) পাশ্চাত্যের বিকৃত ও অপসংস্কৃতি হতে তরুণ সমাজকে তাদের নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে। অবসর সময়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা এবং নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তরুণ ও যুব সমাজকে বেকারত্বের হতাশা ও

নৈরাশ্য তাদের জীবনবিমুখ, অপরাধ প্রবণ ও মাদকাসক্ত করে তুলেছে। শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবী। এক্ষেত্রে তরুণদের স্ব উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) অসাধু রাজনীতিবিদ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বেকার হতাশাগ্রস্থ তরুণদের হাত করে সুকৌশলে তাদেরকে মাদকে আসক্ত করে এক অশুভ শক্তিতে পরিণত করে এবং প্রয়োজন মাফিক নিজের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করে। বর্তমান তরুণ সমাজকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং প্রত্যেককে এরূপ অসাধু রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে চলতে হবে।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের মাদকবিরোধী বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৫) মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীর প্রভাব ও প্ররোচণা, নিছক কৌতুহলবশে, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের আশায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অথবা নিছক ফ্যাশন হিসেবে অনেকে তরুণ মাদক গ্রহণ করে ক্রমাগত আসক্তির দিকে ঢলে পড়েছে। জীবনের কোন সমস্যার সমাধান মাদক হতে পারে না এবং মাদকাসক্ত এক বার হয়ে গেলে সেখান হতে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন এ বিষয়টি তরুণ সমাজকে বুঝতে হবে।

৬) অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সময় দিতে হবে এবং সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অভিভাবকদের কাছ হতে সময় না পেলে সন্তানদের চরিত্রে মারাত্মক একাকীত্বের সংকট ও যন্ত্রনাময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাদের প্রতি অতি শাসন বা অতি আদর হতে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত টাকা প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। সন্তানদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অতি শাসন না করে সাহস যোগাতে হবে এবং সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

৭) যুব সংগঠনের মাধ্যমে তরণ সমাজ নিজ এলাকায় মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করে তাদের নিরাময় প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে পারে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের মাদকাসক্তি হতে মুক্তির জন্য আকুল থাকেন। কিন্তু আসক্তির দুরন্তপণার কাছে পরাস্ত হয়ে যান। তরণ সমাজ এ ধরনের অভিভাবকদের সহযোগিতা করতে পারে।

৮) মাদকাসক্ত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার মধ্যে অপরাধবোধ ও পরাজয়ের মনোভাব গড়ে ওঠে। সে তার পরিবার ও আপনজনদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন, পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধব নেশাগ্রস্থ বলে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তার বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে। তে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা কাটাতে তার প্রয়োজন পড়ে অবিরাম নেশার। এক্ষেত্রে তরণ সমাজ মাদকাসক্তদের ঘৃণা না করে তাকে কাছে টেনে তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে। সঙ্গ বা সাহচর্য পেলে মাদকাসক্ত মাদক ত্যাগের স্বপ্ন দেখতে পারে।

৯) মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে একটি জটিল শরীরবৃত্তিক ও মানসিক রোগের রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং মাদক গ্রহণের বিষয়টি জানার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা যাতে পুনঃআসক্তি সৃষ্টির আগেই যেন তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অত্র তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত থাকলে শিক্ষক ও তার অভিভাবকদের জানাতে হবে এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করতে হবে।

১০) তরুণদের মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি তার অভিভাবক ও শিক্ষকদের স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। অপবাদ ও লোক লজ্জার ভয়ে পরিবারের সদস্যরা মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যদিও এই অসুস্থতা এত বেশি দৃশ্যমান হয় যে শত চেষ্টা করলেও লুকিয়ে রাখা যায় না। অসুস্থতাকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলতে হয়, যা তাদের মানসিকভাবে প্রচন্ড ক্লান্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে অসুস্থতাকে সরাসরি স্বীকার করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ এবং অন্যদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাও তখন কাজে লাগতে পারে।

১১) তরুণদের জন্য চিত্ত-বিনোদনের যথেষ্ঠ সুযোগ থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধূলার আয়োজন করা এবং মাঝে মাঝে শর্টফিল্ম ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাহিত্য সংগঠন, নাট্য সংগঠন, ডিবেট ক্লাব ও সামাজিক কর্মকান্ডে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা দরকার।

১২) মাদকবিরোধী পোস্টার, মাদকবিরোধী বই এবং মহৎ ব্যক্তিদের বই পড়ার প্রতি তরুণ সমাজকে আগ্রহী হতে হবে ও মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তুলে বই পড়ার প্রতি সকল শ্রেণির জনগনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩) তরুণ সমাজ অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তথ্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থসমূহকে জানাতে পারে এবং মাদক ব্যবসায়ীদের ভয়াবহ শাস্তির কথা সকল স্তরের জনগনকে জানাতে পারে যাতে কেউ বিপথগামী না হয়।

১৪) আজকের তরুণ সমাজ আগামি দিনের ভবিষ্যৎ। তারুণ্যে উদ্দীপ্ত এ তরুণ সমাজকে মাদকের মরণ নেশা থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং অন্যদেরকেও মুক্ত রাখতে গণসচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে।

সড়ক পথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশলঃ

১ দেশের অভ্যন্তরে চোরাচালানকৃত মাদকদ্রব্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে বেশি বানিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত ট্রাকে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে গোপনে বস্তাভর্তি মাদকদ্রব্য পরিবহন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা আয়ের নিমিত্ত ট্রাকের ড্রাইভার বা হেলপার অথবা উভয়ে জড়িত থাকে।

২ ট্রাকের মূল পাটাতনের নিচে ফলস পাটাতন তৈরি করে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে। এ যানবাহনের বডির মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকায় সেখানে মাদক রেখে পাচার করা হয়ে থাকে।

৩ যাত্রীবাহী গাড়িতে প্রায়শঃই মাদক পাচার করা হয়ে থাকে। মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যাগে মাদক সংরক্ষণ করে পাচার করে থাকে। তবে মাঝে মাঝে দেখা যায় গাড়ির ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর সহযোগিতায় যাত্রী ছাড়াই ট্যাগ বিহীন মালামাল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মালামালের মধ্যে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে।

৪ যে সমস্ত গাড়ি /ট্রাক/ কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার মাদক পাচারের সাথে জড়িত যানবাহনের একাধিক ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম করার পর তাদের নম্বর প্লেট পরিবর্তন করে যাতে সুনির্দিষ্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদক আটক না করতে পারে।

৫ মাদক ব্যবসায়ীরা যাত্রীবেশে নিজের শরীরের পা থেকে গলা পর্যন্ত বিশেষভাবে তৈরিকৃত চেম্বার সম্বলিত জ্যাকেট, বেল্ট বা পট্টি পরিধান করে ফেনসিডিল পাচার এবং গাঁজার প্যাকেট মোটা কস্টটেপ দিয়ে শরীরের সাথে পেঁচিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাচার করে থাকে। এরূপ কিছু কছু ক্ষেত্রে ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার পাচারের বিষয়টি অবহিত থাকে।

৬ ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর সহযোগিতায় যাত্রীবাহী কোচের ছাদে, সীটের তলায় এবং অত্যাধুনিক কোচের মালামাল বহনের জন্য বড ও টুলস বক্স মাদক বহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭ গাড়িতে পরিবহনকালে কাচাঁ/পাকা কাঁঠালের মধ্যে, নারিকেলের মধ্যে, কাঠের গুড়ির মধ্যে তৈরি করা ফাঁকা চেম্বারে, তরমুজের মধ্যে, গুড়ের গাদনে, কাপড়ের গাইটের মধ্যে, চাল, গম বা ভুট্টার বস্তায়, তেলের ড্রামের মধ্যে, ভুসি ও তুষের

বস্তায়, কুমড়ার খোলের মধ্যে, আমের ঝুড়িতে, শাক-সবজির মধ্যে, ডিম ও কাঁকড়ার ঝুড়িতে, কফিন ইত্যাদির মধ্যে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে।

৮ এ্যাম্বুলেন্সে রোগী সাজিয়ে মাদক পাচার করা হয়ে থাকে।

রেলপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশলঃ

১) রেল গাড়ির বাথরুম, দুই বগির মাঝের স্থান, বগির কোনায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থান, বাথরুমের উপরের পানির ট্যাংক, বগির নিচে ফাঁকা স্থান, ছোট ছোট কুঠুরি তাক ইত্যাদি মাদক পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

২) রেলের রান্নাঘর, গার্ডরুম, ডাকগাড়ি, ইঞ্জিন রুম, চালকের কেবিন, ইত্যাদি স্থানে মাদক লুকিয়ে পরিবহন করা হয়। রেলকর্মীদের সাথে গোপন যোগসাজশে এরূপভাবে মাদক পাচার হয় মর্মে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার রিপোর্টে অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩) মাদক চোরাচালান রুটের নিকটবর্তী স্টেশনের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে রেলগাড়ি থামিয়ে মাদকের চালান রেলগাড়িতে ওঠানো হয় এবং গন্তব্য এলাকার নিকটবর্তী রেল স্টেশনের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে, কখনও কখনও দুই স্টেশনের মধ্যবর্তী রেল লাইনের পাশে সুবিধাজনক নির্দিষ্ট স্থানে রেলগাড়ির গতি শ্লথ হয়ে যায় এবং মাদক ব্যবসায়ীরা তখন রেলগাড়ি হতে মাদকের বস্তা বা পুটলি তাদের সঙ্গীদের নিকট নিক্ষেপ করে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রেলকর্মীদের সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের যোগসাজস রয়েছে মর্মে প্রায়শঃই পত্রিকার রিপোর্টে অভিযোগ পাওয়া যায়।

নৌপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশলঃ

১) নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী ট্রলার, নৌকা এবং Cargo Vessels মাদক পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) লঞ্চ ও স্টীমারযোগে মাদক পাচার অন্যতম একটি সহজ উপায়। লঞ্চের পাটাতনের নিচে মাল রাখার জায়গায় সাধারণত মাদক বেশি পাচার হয়ে থাকে।

৩) মাছ ধরার ট্রলার এবং নৌকা মাদক পাচারে ব্যবহৃত হয়।

আকাশপথে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের কৌশলঃ

১) মাদক ব্যবসায়ীরা যাত্রীবেশে শরীরের বিভিন্ন অংগে বেধে মাদক পাচার করে থাকে

২) কনডম বা পলিথিনে মাদক ভরে গলাধকরণ করে মাদক পাচার করে থাকে।

৩) লাগেজ অথবা কার্গো বিমানে আমদানি/রপ্তানিকৃত মালামালের ভিতর মাদক রেখে পাচার করে থাকে।

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধে পরিবহন মালিকদের ভূমিকাঃ

১) বানিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানের মালিকদের সচেতন হতে হবে এবং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মামলামাল পরিবহন করা হবে তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে। ট্রাকের ড্রাইভার এবং হেলপারের ক্ষেত্রে নজরদারি রাখতে হবে যাতে তারা মালামালের সাথে মাদকপাচারে সহযোগিতা না করে।

২) ট্রাকের মূল পাটাতনের নিচে ফলস পাটাতন তৈরি করা আছে কিনা সে বিষয়ে মালিকদের মাঝে মাঝে চেক করা উচিত।

৩) যাত্রী ছাড়াই ট্যাগবিহীন মালামাল পরিবহন করা হতে গাড়ির ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে বিরত রাখার জন্য মালিককে ভূমিকা রাখতে হবে।

৪) গাড়ি /ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার যাতে যানবাহনে একাধিক ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য মালিককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মাঝে মাঝে গাড়ী চেক করে দেখতে হবে যানবাহনে কোন ভূয়া নম্বর প্লেট রয়েছে কিনা।

৫) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার মাদক পাচারের সাথে সহযোগী কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে হবে এবং নজরদারি রাখতে হবে।

৬) এ্যাম্বুলেন্সে রোগী সাজিয়ে যাতে মাদক পাচার করতে না পারে সেজন্য প্রতিষ্ঠানকে নজর রাখতে হবে। কোনো রোগী কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানকে খোঁজ খবর নিতে হবে এবং এ্যাম্বুলেন্সে আরোহনকারী প্রকৃতপক্ষে রোগী কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

৭) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার নিজে মাদকাসক্ত কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে ডোপ টেস্ট করা যেতে পারে। ডোপ টেস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট পেলেই তাদের নিয়োগ দেওয়া বাঞ্চনীয়।

৮) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে তাদের অতীত ইতিহাস জেনে নিতে হবে। বিশেষ করে তারা কোনো মাদক মামলার আসামী কিনা।

৯) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার মাদকাসক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করাতে হবে।

১০) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর জন্য মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মাদক গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি না হয়।

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধে পরিবহন শ্রমিকদের ভূমিকাঃ

১) বানিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এ বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে গোপনে বস্তাবর্তি মাদকদ্রব্য পরিবহন করা হয়ে থাকে। বাড়তি টাকা আয়ের নিমিত্ত ট্রাকের ড্রাইভার বা হেলপারকে এরুপ অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

২) মাঝে মাঝে দেখা যায় গাড়ীর ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর সহযোগীতায় যাত্রী ছাড়াই ট্যাগ বিহীন মালামাল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এরুপ মালামাল পরিবহন বন্ধ করতে হবে।

৩) গাড়ী/ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার কে যানবাহনে একাধিক ভূয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে।

৪) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে বঙ ও টুলস বঙ মাদক বহনের সুযোগ প্রদান করা বন্ধ করতে হবে।

৫) এ্যাম্বুলেন্সে রোগী সাজিয়ে মাদক পাচার করা হতে বিরত থাকতে হবে।

৬) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপারকে মাদক সেবন হতে দূরে থাকতে হবে। এদের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত হলে পরিবহনের মালিককে অবহিত করতে হবে এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হতে হবে।

৭) মাদক সেবনরত অবস্থায় যানবাহন চালালে যেকোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাদক সেবন করার পর ঝিমুনী এবং তন্দ্রাচ্ছন দেখা দেয়। ফলে সহজেই দূর্ঘটনায় পতিত হয়।

৮) ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার যদি অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের যানবাহনে কোন যাত্রী মাদকসহ ভ্রমন করছেন তাহলে অনতিবিলম্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাতে হবে।

৯) বাসস্ট্যান্ড ও বাসস্ট্যান্ডের আশেপাশে এবং বাসস্টপেজে মাদক পাওয়া গেলে তা অনতিবিলম্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানাতে হবে।

মাদকের অপব্যবহার ক্রমবৃদ্ধির কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম হুমকির সন্মুখীন হয়ে পড়েছে। যানবাহনের ড্রাইভার/সুপারভাইজার/হেলপার এর একটা অংশ মাদকাসক্ত হওয়ায় প্রায়শঃই দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে বহু লোকের প্রানহানি ঘটছে, তেমনি পঙ্গুত্ব বরণ করেছে শত শত মানুষ। এছাড়া তারা জড়িয়ে পড়েছে নানাবিধ অসামাজিক কর্মকান্ডে। তরুণ সমাজের একটা অংশ মাদকাসক্ত হওয়ায় তাদের মেধাশক্তি বিনষ্ট হওয়াসহ দেশের আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটছে। মাদকের করাল গ্রাস হতে তাদেরকে বাচাঁতে হলে মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া পরিবহন মালিক - শ্রমিক একত্রে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালে বাংলাদেশের পরিবহন জগতে মাদকাসক্তি মুক্ত করা সম্ভব এবং দেশের অভ্যন্তরে এক জায়গা হতে অন্য স্থানে মাদক পাচার প্রতিরোধ করা সহজতর হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ কার্যালয় (দক্ষিণ) কর্তৃক রাজধানীর রামপুরা ও খিলগাঁও হতে আইস, ইয়াবা ও অস্ত্র আটকের চিত্র।

কেমন হবে আগামী দিনের মাদকাসক্তের চিকিৎসা

মো: মেহেদী হাসান

উপ-পরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, গাজীপুর

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সতেরটি লক্ষ্যের মধ্যে তিন নম্বর হল "সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ"। "চেতনাবিনাশী ঔষধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহারসহ সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা" নামক তিন দশমিক পাঁচ লক্ষ্যমাত্রা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি জড়িত। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর তথ্য মতে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ৫৪% প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষেভাবে চিকিৎসা সেবা এবং পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রয়াজেনীয় পরামর্শ সেবা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে দৃশ্যমান কোনো উন্নতির দেখা পাচ্ছি না। কারণ চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা পুনরায় মাদকে ফিরে আসছে। নতুন পথের সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমান বিশ্ব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জগত কেমন হতে পারে আগামী দিনের এই চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মাদকাসক্তদের সঠিক চিকিৎসা। আগামী দিনে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স প্রযুক্তিসমূহ বাস্তবে রূপ নেবে এবং একই সাথে বাড়তে থাকবে জিন থেরাপি, ক্রিসপার পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার। এখন আমরা জিন থেরাপি, ক্রিসপার পদ্ধতিগুলো কীভাবে ব্যবহার করবো তার প্রাথমিক ধারণা নিতে পারি।

ধরা যাক, কোকেন সেবনকারী রোগীদের কথা। কোকেন চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের বিকল্প হিসাবে বা ওভার ডোজের প্রতিরোধক টিকা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে জিন থেরাপি। কোকেন সেবনে মস্তিকে অতিরিক্ত ডোপামিন নি:সৃত হয় এবং একই সাথে কোকেন মস্তিষ্কে ডোপামিন পরিবাহককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে অতিরিক্ত ডোপামিন মস্তিষ্কে উচ্ছ্বাস (ইউফোরিয়া) সৃষ্টি করে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে একই পরিমাণ ডোপামিন নি:সৃত করতে আস্তে আস্তে অতিরিক্ত কোকেনের দরকার হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত কোকেন, শরীরের জন্য খুবই মারাত্মক হয়। অতিরিক্ত কোকেন সেবনে হার্ট সঞ্চালন অনিয়মিত হয়, বন্ধ হতে পারে, নি:শ্বাস নিতে সমস্যা হয় বা স্ট্রোক হতে পারে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৭ সালে মাদকের ওভার ডাজে ১৪,০০০ লোক মারা যায়। কোকেনে আসক্ত রোগীদের মাদক চিকিৎসায় প্রচুর কাজ করতে হয়। সহজ কোনো পন্থা নেই যদিওবা এই ডোপামিন নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে অনেক ঔষধ বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, প্রাকৃতিকভাবেই লিভারে বিউট-াইরাইলকোলিনএস্টারেজ (BChE) এনজাইমটি তৈরি হয় যা এই কোকেন চিকিৎসায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এই এনজাইমটি কোকেন অর্থাৎ এস্টার জাতীয় যৌগগুলোকে ভাঙ্গতে পারে। উপরন্ত নিউরনকে উদ্দীপিত করে এবং পেশীসমূহকে শিথিল করে। যেসকল বিষ স্নায়ুকোষের কার্যকারিতাগুলোকে ধ্বংস করে তাদের ক্ষেত্রে এই বিউটাইরাইলকোলিনস্টারেজ এনজাইমটি ব্যবহৃত হয়। কোকেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যাবার পূর্বেই এই এনজাইমটি রক্তে কাজ করবে ।

ফলে কোকেন সেবীরা কোকেন গ্রহণ করলেও মস্তিষ্কে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না বা অতিরিক্ত কোকেন সেবনে মারা যাবে না। জিন থেরাপির মাধ্যমে এই এনজাইম তৈরির প্রোটিনকে পরিবর্তন করে অর্থাৎ কার্যক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারলে এই এনজাইম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তে মিশ্রিত হবে এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোকেনকে ভাঙ্গতে সক্ষম হবে।

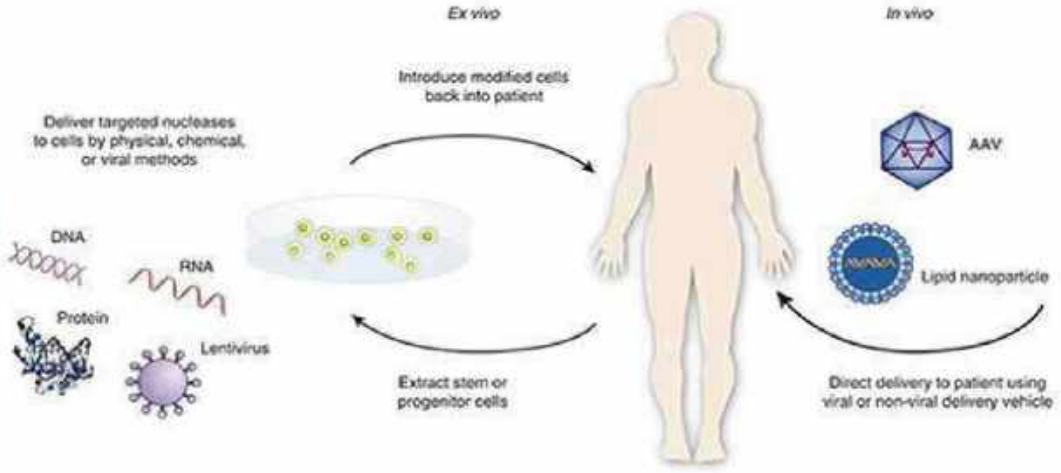

ভেক্টর নামক ভাইরাসকে এক্ষেত্রে বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এই ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রোটিনগুলো সরিয়ে বিউটাইরাই-লকোলিনএস্টারেজ প্রোটিন তৈরি হয় এমন ডিএনএগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে। গত এক দশক ধরে এই পরীক্ষাগুলো করা হচ্ছে। যাই হোক জার্নাল ভ্যাকসিন ২০১৪ সালের সাইন্টিফিক রিসার্চ পেপারে একটা রোডেন্ট মডেল পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত পেপারের পরীক্ষায় এক গ্রুপ ইঁদুরকে বিউটাইরাইলকোলিনএস্টারেজ প্রোটিন তৈরি করতে সক্ষম এমন পরিবর্তিত জিন সম্বলিত এক ট্রিলিয়ন ভেক্টর ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করানো হয়। অপর গ্রুপকে শুধুমাত্র স্যালাইন ওয়াটার দেয়া হয়। এরপর দুই গ্রুপেরই অক্সিজেন গ্রহণ, বিভিন্ন শারীরিক মেটাবলিজম, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিবর্তন দেখা হয়। কিন্তু কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। এরপর দুই গ্রুপের ইঁদুরের শরীরে কোকেন প্রবেশ করানো হয়।

দ্বিতীয় গ্রুপে সাধারণ কোকেন সেবনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও প্রথম গ্রুপে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। রক্ত পরীক্ষা করে প্রথম গ্রুপে ৮-১৬ মাস অবধি বিউটাইরাইলকোলিনএস্টারেজ এনজাইমটি লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়। সুতরাং ১৬ মাস পর্যন্ত পুনরায় কোকেন আসক্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

প্রোটিন প্রদান করতে পারে এমন ভাইরাল ভেক্টর ১৯৭০ সালে আবিষ্কৃত হয়। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৬ টি এমন ভেক্টর ভাইরাস সীমিত আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারমধ্যে কোভিড-১৯ এর জন্য ৪টি এবং ইবোলা টিকার ক্ষেত্রে ২ টি। জিন থেরাপি সাধারণত ম্যালেরিয়া, ইবোলা, যক্ষ্মা, কোভিড, মারস, ইনফ্লুয়েজা, প্রোস্টেট ক্যান্সার এসব রোগে সীমিত আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু যারা ইনজেকশন বা ভ্যাকসিন নিতে ভয় পাবে তাদের জন্য ব্যবহার করা হবে ক্রিসপার পদ্ধতি। ক্রিসপার পদ্ধতিতে প্যাচ তৈরি করা হবে যা চামড়ার স্টেম সেল এর সাথে কাজ করবে। কোকেন সেবীদের চিকিৎসায় এটাও সমানভাবে কার্যকর হতে পারে। ক্যাস ৯ এনজাইমটি ডিএনএর একটি টার্গেট অংশে কাটবে এবং বিউটাইরাইলকোলিনএস্টারেজ প্রোটিন তৈরির অংশে নতুন ডিএনএ জোড়া দেবে। ফলে প্যাচের মাধ্যমে চামড়ার স্টেম সেলে বিউটাইরাইলকোলিনএস্টারেজ এনজাইমটি তৈরি করবে এবং রক্তে মিশবে। এ পদ্ধতিতে রক্তে ১০ সপ্তাহ বিউটাইরাইলকোলিনএস্টারেজ এনজাইমটির উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

দুইটি পদ্ধতি এখন পর্যন্ত পরীক্ষাগারেই রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কারণ ইঁদুরের মস্তিষ্ক ও মানুষের মস্তিষ্ক পুরাপুরি এক নয়। তবে সেদিন খুব দূরে নয় যখন কোকেনসহ সকল ভয়াবহ মাদক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে জিন থেরাপি এবং ক্রিসপার।

২৮ সেপ্টেম্বর- ০৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠেয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ৫০তম ইকো প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক দায়িত্ববোধ: পারিবারিক অনুশাসন ও নৈতিকতা

শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম

সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকাসক্তি একটি জঘন্য সামাজিক ব্যাধি। জনগণের সামাজিক আন্দোলন, গণসচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব। আমাদের যুবসমাজে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলছে। বর্তমানে আইন শৃঙখলার অবণতি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যুবসমাজের মাদকাসক্তি।

কৌতূহল, পারিবারিক অশান্তি, বেকারত্ব, প্রেমে ব্যর্থতা, বন্ধুদের অসৎ সঙ্গ, নানা রকম হতাশা ও আকাশ-সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। যার কারণে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যেকোনো অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে এদের বিবেক বাধা দেয় না। মিথ্যা কথা বলা তাদের স্বাভাবিক বিষয়। কোনো ধরনের অপরাধবোধ তাদের স্পর্শ করে না। ধর্মের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছে। ভালোবাসা কিংবা স্নেহ-মমতাও তাদের স্পর্শ করতে পারে না। মাদক সেবনকারীদের দেহমন, চিন্তা-চেতনা, মনন, আবেগ, বিচারবুদ্ধি সবই মাদকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফলে মূলত নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বিচারক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, আদর্শ সবকিছুই নিঃশেষ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সমাজের বহু মেধাবী ও সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান তরুণ মাদকের নেশার কবলে পড়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের পথ বেছে নিয়েছে। যারা নেশা করে তাদের অধিকাংশই জানে না যে, নেশা কোনো রকম উপকারী বা ভালো কাজ নয় বরং এটা নিজেদের মেধা ও জীবনীশক্তিই ধ্বংস করে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছে নানাভাবে। যেসব পরিবারের সন্তান নেশাগ্রস্ত হয়েছে, সেসব পরিবার কতটা দুর্দশার শিকার, শুধু তারাই জানে। এ দুর্দশা অন্ত:হীন। জীবন বিনাশকারী এ নেশার কবলে পড়ে অসংখ্য তরুণের সম্ভাবনাময় জীবন আজ ধ্বংসের পথে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা, পরিমিত জীবন যাপন, বন্ধু নির্বাচন, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রথমত, আমরা যদি পারিবারিকভাবে চিন্তা করি,

*সন্তানের উপর খেয়াল রাখতে হবে সে কেমন বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশছে, কোনো অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছে কিনা। সন্তানের রাত জাগা ও দিনে ঘুমানোকে নিরুৎসাহিত করুন। বাইরে বা রেস্তোঁরাতে সে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইলে তাকে বাসায় বন্ধুদের ডেকে আড্ডা দিতে উৎসাহিত করুন। হাতখরচ হিসেবে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

*মাদক নিরাময়ে প্রয়োজন পরিবারের আন্তরিকতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা। অভিভাবকেরা যেকোনো ধরনের মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, পারিবারিক জীবনে নৈতিকতার চর্চা করুন। পরিবারের কেউ মাদকে আসক্ত হলে তাকে এর খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে বুঝাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

*প্রত্যেক পরিবারের প্রধানের উচিৎ তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উত্তম প্রশিক্ষণ দান করেন এবং নিজেদের সন্তানদের মধ্যে এ অভ্যাস যেন গড়ে না উঠে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকেন। অসৎ ও দুশ্চরিত্রবান বন্ধু-বান্ধব গ্রহণের পরিবর্তে যেন সৎ চরিত্রবান বন্ধুদের সাথে মেশে সে উপদেশ দান করেন।

*খেলাধূলাসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিয়োজিত থাকতে সন্তানদের উৎসাহিত করতে হবে। পিতা-মাতারা যদি তাঁদের ব্যস্ত সময়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ সন্তানের জন্য বরাদ্দ রাখেন, তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধিবিধান ও অনুশাসনের শিক্ষা দেন, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের জীবনের জটিল সমস্যাবলি সমাধানে অত্যন্ত সচেতন ও মনোযাগী হন, তাহলেই যুবসমাজে মাদকাসক্তির প্রতিরোধ বহুলাংশেই সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায়,

মাদকের বিরুদ্ধে বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ ও আন্দোলন চলছে, তার মূল সূতিকাগার হতে পারে পরিবার তথা সমাজ। একই সঙ্গে এখান থেকেই মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রতিরোধ করতে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলা যাবে। আপামর সচেতন জনগণকে নিয়ে কোনো এলাকার বা কোনো সমাজের নেতা যদি মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রচেষ্টা চালান সে এলাকা বা সমাজে কখনও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রসার ঘটতে পারেনা। আসক্ত প্রত্যেককে বোঝাতে হবে যে মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করার জন্য নিজের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট ।

সমাজের প্রতিটি পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহর, গ্রাম, মহল্লা বা এলাকায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত সভা, সেমিনার, উঠোন বৈঠক, কর্মশালার আয়াজেন করতে হবে । মাদকদ্রব্য পরিত্যাগের ব্যাপারে আসক্ত ব্যক্তিদের স্বভাব বদলে ফেলে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

অভিভাবক ও মুরব্বিদের নিয়ে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। মাদকাসক্তি ত্যাগে আসক্তদের ভালো কাজে উৎসাহিত ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, কিশারে-যুবকদের মাদকাসক্তি রোধে শিক্ষকদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পারিবারিক অনুশাসন, সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বিবেক ও নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিধিবিধান ও নৈতিকতা সম্পর্কিত শিক্ষামূলক ক্লাস নিতে পারেন। শিক্ষকদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, নির্দেশনা, উপদেশ ও অভ্যাসের প্রভাব ছাত্রদের উপরে পড়ে থাকে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের মধ্যে এ বদ অভ্যাস গড়ে উঠার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং এ ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রয়াজেনীয় নির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহলে ছাত্ররা এ পথে পা বাড়াতে সহজে সাহস পাবে না।

সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন থেকে মাদকাসক্তি নির্মূল করতে হলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি দরকার মানুষের বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা থাকতে হবে।

মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করার জন্য নিজের ইচ্ছা শক্তির গুরুত্বকে ব্যাপকভাবে বুঝাতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিটি পরিবার প্রধানকে সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে। পারিবারিক অনুশাসন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। জনগণকে প্রাণঘাতী নেশার ভয়াবহ থাবা থেকে রক্ষার জন্য মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারে গণমাধ্যমকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এর কুফল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তথ্য প্রদান/প্রচার করতে হবে। মাদকাসক্তদের সুস্থ করে সমাজের কর্মে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

'মাদককে নিয়ন্ত্রণ করবো-সৃষ্টিশীল, সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য, ক্ষতিকর দিক দ্বারা আমরা যেন নিয়ন্ত্রিত না হই'-এটাই হোক আমাদের মূলমন্ত্র!

সুতারাং, মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে সকলকে সম্মিলিত ভাবে পারিবারিক অনুশাসন ও নৈতিক মূল্যবাধে মেনে চললে দেশ সুস্থ ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হবে।

০১ নভেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ১০৪ কেজি গাঁজা আটকের চিত্র।

ঔষধ হিসেবে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির

পরিদর্শক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা।

মাদকদ্রব্য শব্দটি শুনা মাত্র প্রতিটি মানুষের মনে একটি নেতিবাচক চিত্র ভেসে ওঠে। মাদকের অপব্যবহার মানুষের জীবনকে যেমন করেছে দুর্বিসহ, তেমনই এর ব্যবহার মানুষের জীবনকে করেছে সুন্দর ও সুখময়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-তে মাদকদ্রব্যের প্রতিরোধের বিষয়টি যেমন উল্লেখ আছে, তেমনই চিকিৎসা, ঔষধ, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহারের বিষয়টিও উল্লেখ আছে। Single Convention on Narcotic Drugs, 1961- এ মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে Prevent abuse, diversion and ensure the availability of drugs for medical purposes. তাছাড়া United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) একটি discussion paper-এ উল্লেখ করেছেন "Ensuring availability of controlled medications for the relief of pain and preventing diversion and abuse". মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-তে উল্লিখিত আফিম জাতীয় বা Opioids নামক মাদকদ্রব্যগুলোর চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহার মানব জীবনে এনেছে ব্যথাহীন প্রশান্তি ও আরাম।

মানুষের কাছে Opioids হলো সবচেয়ে পুরাতন ও শক্তিশালী ব্যথা নিরোধক। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বছর পূর্বের পুরাতন সুমেরিয়ান (Sumerian) এবং মিশরীয় (Egyptian) চিকিৎসা গ্রন্থে Opium latex এর উৎস হিসেবে এর উল্লেখ রয়েছে যা মানুষের কাশি, অনিদ্রা ও ব্যথা থেকে আরাম দেয়। Opium popy চাইনিজ চিকিৎসকদের কাছে Ying suke নামে পরিচিত যা ঐতিহ্যগত চাইনিজ ঔষধের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে। এই ঔষধ দিয়ে এ্যাজমা, ডায়রিয়া, আমাশয়, অনিদ্রা ও তীব্র ব্যথার চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। Opium latex এর মধ্যে ১০-২০% মরফিন বিদ্যমান থাকে।

কোন ধরনের রোগে Opioids চিকিৎসা দরকার

ক্যান্সার, HIV/AIDS, surgical cases, ক্রমবর্ধমান স্নায়ুতন্ত্রের অসুখ, কিডনি ও হৃৎপিন্ডের অকার্যকারিতা, ফুসফুসের অন্তিম পর্যায়ের অসুখসহ অন্যান্য জীবন সীমিতকারী অসুখ। বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে সারা দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ ক্যান্সার রোগী আছে। তাছাড়া প্রতিবছর ০২ লক্ষের অধিক লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ও ১.৫ লক্ষের অধিক লোক ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করে থাকে। বর্তমানে সারা দেশে মোট HIV পজেটিভ লোক ৭৫০০ জন। বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীদের ৮০% এর ক্ষেত্রে জীবনের শেষ ০৩ মাসে তীব্র ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য প্রতিদিন ৬০-৭৫ মি: গ্রা: Opioid (মরফিন) লাগে এবং AIDS রোগীদের ৬০% এর ক্ষেত্রে জীবনের শেষ ০৩ মাসে তীব্র ব্যাথা থেকে মুক্তির জন্য প্রতিদিন সম পরিমাণ Opioid (মরফিন) প্রয়োজন হয়।

ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু মাদকদ্রব্যের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

মরফিন

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{17}H_{19}NO_3$. মরফিন আফিমের বৃহত্তম এ্যালকালয়েড। ব্যথা নিবারণের জন্য মরফিন সরাসরি মানব দেহের CNS এর উপর ক্রিয়া করে থাকে।

"In clinical medicine, Morphine is regarded as the gold standard or benchmark of opioid analgesics used to relieve severe or agonizing pain and suffering". মরফিন ব্যবহারের সময় অ্যালকোহল পান করা যাবে না। কারণ এতে মৃত্যু হতে পারে। মরফিন ক্যান্সারের তীব্র ব্যথাসহ দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা নিবারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মরফিন একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল মাদক যা মানব দেহের CNS এর Mu-opioid Receptor এবং Gastrointestinal tract এর উপর কার্যকর থাকে। মরফিন মানব দেহের Mu-Opioid Receptor এর সাথে শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে ব্যথা নিবারণসহ ঘুমের আবির্ভাব সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া মরফিন হলো WHO এর অত্যাবশ-কীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত একটি Opioid analgesic. এটা আইনের দৃষ্টিতে একটা মাদক।

পেথিডিন

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{15}H_{21}NO_2$. এটা একটা Synthetic Opioid Analgesic. এটা মধ্যম থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথা নিবারণে ব্যবহৃত হলেও বিশেষত প্রসবাবস্থায় (Labour pain in childbirth) অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকা ভূক্ত একটা Opioid analgesic.It is commonly used in medicine pre and postoperatively relieve the pain.

কোডিন

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{18}H_{21}NO_3$. এর প্রাকৃতিক আইসোমার হলো Methylated morphine বা 3-Methyl-morphine. কোডিন আফিমের ২য় বৃহত্তম অ্যালকালয়েড। একে আফিমের ভেষজ (Tincture) বলা হয়ে থাকে। এটা মৃদু থেকে মধ্যম মাত্রার ব্যথাসহ কাশি ও ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মৌলিক ঔষধের তালিকাভুক্ত একটা Opioid. তাছাড়া কোডিন হলো WHO এর অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভূক্ত একটা Opioid analgesic. এটা আইনের দৃষ্টিতে একটা মাদক।

মেথাডন

এর রাসায়নিক সংকেত $C_{21}H_{27}NO$. এটা IAHPC-এর অত্যবশকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত একটা Synthetic Opioid. চিকিৎসা শাস্ত্রে এটা একটা ব্যথা নিরোধক ড্রাগ হলেও আইনের দৃষ্টিতে মাদক। রাশিয়াতে মেথাডন ট্রিটমেন্ট অবৈধ হলেও আমাদের দেশে বৈধ। এটা প্রধানত: Opioid Dependence এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটা আইনের দৃষ্টিতে একটা মাদক।

হাইড্রোমরফিন

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{17}H_{19}NO_3$-HCL. এটা মরফিন-উদ্ভূত একটা সেমি-সিনথেটিক ড্রাগ। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Opioid Analyesic ও আইনের ভাষায় মাদক বলা হয়। একে সাধারণত শিরায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটা পানিতে মরফিনের চেয়ে দ্রুত দ্রবীভূত হয়। এটা মরফিনের চেয়ে ৬-৮ গুণ শক্তিশালী। এটা ব্যথা যুক্ত শুকনো কাশি ও তীব্র ব্যথা নিবারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভূক্ত একটা Opioid analgesic.

ফেন্টানিল

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{22}H_{28}N_2O$. এটা একটা সিনথেটিক Opioid Analgeisc যার কার্যকারিতা কম সময় স্থায়ী হলেও দ্রুত কাজ করে থাকে। এটা মরফিন থেকে প্রায় ১০০ গুণ শক্তিশালী।

Fentanyl Transdermal patch পদ্ধতিতে তীব্র ব্যথা নিবারণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা ২০১২ সালে Synthetic opioid হিসাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ক্যান্সারের তীব্র ব্যথাসহ দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা নিবারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা খুব সহজেই CNS- এ প্রবেশ করতে পারে। এটা অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভূক্ত একটা Opioid analgesic.

অক্সিকোডন

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{18}H_{21}NO_4$. এটা একটা Semi-Synthetic Opioid Analgesic যা দীর্ঘস্থায়ী ও মধ্যম থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথা নিবারণে ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার ২০০১ সালে ক্যান্সারের ব্যথা নিবারণের জন্য Oral Morphine এর বিকল্প হিসেবে Oral Oxycodon ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। এটা অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত একটা Opioid analgesic.

হাইড্রোকোডন:

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{18}H_{21}NO_3$. এটা একটা Semi-Synthetic Opioid যা কোডিন থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে। হাইড্রোকোডন নারকটিক এনালজেসিক হিসেবে কাশি, মধ্যম থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথা নিবারণে Oral Medicine হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা Oxycodone থেকে ১.৫ গুণ কম শক্তিশালী। এটা খাওয়ার ২০-৩০ মিনিট পর থেকে ব্যথা নিবারণ শুরু করে ৪-৮ ঘন্টা পর্যন্ত বলবৎ থাকে। Hydrocodone মার্কিন যুক্তরাষ্টে Predominantly প্রেসক্রাইব হয়ে থাকে। ২০০৭ সালে সারা বিশ্বে সরবরাহকৃত Hydrocodone-এর ৯৯% USA-তে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে INCB জানান। এটা মানব দেহের CNS এর এমইউ (Mu) Opioid Receptors-এর সাথে বন্ধন তৈরি করে ব্যথা নিবারণ করে থাকে।

ট্রামাডল

এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{16}H_{25}NO_2$. এটা একটা Synthetic Opioid Analgesic. এটা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যম থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এর কার্যকারিতা অন্যান্য Strong Synthetic Opioid এর মতো না হলেও এটা যখন প্যারাসিটামল এর সাথে কম্পোজিশন ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তখন মানবদেহে

দ্রুত কাজ করে। এটা শুরু থেকেই একটা নিরাপদ non-additctive pain–relieving medication হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Opioids কিভাবে মানবদেহে কাজ করে ঃ

মানব দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (Central Nervous System) পাঁচ প্রকারের বিভিন্ন ধরনের Opioid Receptor Proteins থাকে। প্রাথমিক ভাবে এই Receptor-গুলো মানুষের দেহের Digastive Tract, Brain এবং Spinal Cord-এ অবস্থান করে থাকে। যখন কোনো মানুষ Opioid Medication গ্রহণ করে তখন এই ড্রাগ দেহের ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডে অবস্থিত Opioid Receptors-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে মানুষের ব্যথার অনুভূতিকে কমাতে থাকে। কিছু Opioid Receptors ডেল্টা (Delta), সিগমা (Sigma), কাপপা (Kappa) এবং এমইউ (Mu) নামে পরিচিত যা একজন মানুষের আনন্দ উপলব্ধিতে সহায়তা করে থাকে। যখন একটা Narcotics Medication এই Receptors-গুলোকে উত্তেজিত করে তখন ঐ ব্যক্তি প্রচন্ড উত্তেজনাকর আনন্দ অনুভূতি পেয়ে থাকে।

পেইন ট্রিটমেন্টের বাধাসমূহ ঃ

গত কয়েক দশক ধরে WHO, INCB, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণায় পেইন ট্রিটমেন্টের বাধাসমূহ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন। এই সমস্ত গবেষণা থেকে দেখা যায় বিশ্বের অনেক দেশ পেইন ট্রিটমেন্ট প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। গবেষণাপত্রে Opioid Medications এর অপর্যাপ্ততাকে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া এই বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

উপসংহার ঃ

আক্রান্ত রোগীদের মধ্যম থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথা নিরাময়ের জন্য মরফিন সহ অন্যান্য Opioid Medications এর সহজ-লভ্যতা সৃষ্টি করা দরকার। এক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সরকার, Health Care Providers সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। Human Rights Watch এর মতে Access to pain Treatment as a human right.

জীবনকে ভালোবাসুন,
মাদক থেকে দূরে থাকুন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা এ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নের নিমিত্ত আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

১৪ মে ২০২২ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

১৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

১৫ মার্চ ২০২২ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রণয়নের নিমিত্ত আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা এ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রণয়নের নিমিত্ত আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ।

২৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), বাংলাদেশ ও নারকটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), ভারত এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে (ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম) অনুষ্ঠিত ৭ম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

২৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রি: তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), বাংলাদেশ ও নারকটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), ভারত এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে (ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম) অনুষ্ঠিত ৭ম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

২৬ আগষ্ট ২০২১ খ্রি: তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, টেকনাফ বিশেষ জোন, কক্সবাজার কর্তৃক ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পিস ইয়াবা উদ্ধার চিত্র।

২৯ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নে রাজশাহী বিভাগের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

০১ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নে রংপুর বিভাগের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, জনাব টিপু মুনশি, এমপি।

২২ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নে বরিশাল বিভাগের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি।

২৯ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নে খুলনা বিভাগের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

১৩ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য "সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)" প্রণয়নে সিলেট বিভাগের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি।

০৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ, অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

promises medical limited
center for de-addiction & depression

Promises Medical Limited

মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত।

" একটি প্রতিশ্রুতি-ই সুস্থতার প্রথম ধাপ "

'প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড' একটি পূর্নাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র । দশ তলা ভবন বিশিষ্ট বাংলাদেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠান, আমাদের দীর্ঘ দিনের সু-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি দক্ষ পেশাদার টিম সর্বদা চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত। আমাদের প্রশিক্ষিত মাদকাসক্তি নিরাময় কাউন্সিলর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। মানসিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং দক্ষ পেশাদার নার্স দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা দল আমাদের অন্যতম শক্তি।

প্রথম পুরস্কার (২০১৬-২০১৭)

দ্বিতীয় পুরস্কার (২০১৫-২০১৬)

আমাদের চিকিৎসা সেবাঃ

- তথাকথিত গতানুগতিক ধারার বাহিরে লাইফ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আমাদের চিকিৎসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- মোটিভেশন অথবা রোগীকে চিকিৎসা গ্রহনে উৎসাহিত করা।
- ব্যাথামুক্ত ডিটক্সিফিকেশন /নেশা মুক্তকরণ চিকিৎসা।
- সাইকোথেরাপি এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার।
- ২৪/৭ ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ডবয়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষন।
- মহিলা রোগীদের জন্য আলাদা ফ্লোরের ব্যবস্থা।
- মহিলা রোগীদের সার্বক্ষনিক মহিলা সার্ভিসকর্মী ও নার্স দ্বারা সেবা প্রদান।
- একটি সম্পূর্ণ ফ্লোরে থেরাপি ও বিনোদনের ব্যবস্থা।
- আমাদের রয়েছে অত্যাধুনিক ব্যায়ামাগার।
- মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগীর জন্য আলাদা ফ্লোরের ব্যবস্থা।

সারা বাংলাদেশ থেকে সার্ভিস টিমের মাধ্যমে রোগী আনা হয়।
বিঃদ্রঃ যারা বারবার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে আবারও ড্রাগ নিচ্ছেন ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন,তাদেরকে দিচ্ছি সুচিকিৎসার নিশ্চয়তা।

24/7 HELPLINE

+88 01622997766

Address:

House# 17, Road# 20, Block# J, Baridhara, Dhaka 1212.
Tel: +88028836410, Email: info@promisesbd.com

/promisesBD www.promisesbd.com Promises Medical Limited

PROTTOY MEDICAL CLINIC LTD.

Psychiatry & De-addiction Hospital

Prottoy is the leading psychiatric, drug and alcohol rehabilitation facility in Bangladesh. Since 2002, we have treated over 7000 patients for drug and alcohol abuse, psychiatric illness and depression. Our patient recovery rate for drug and alcohol addiction is 65% (the worldwide recovery rate is less than 10%). Our psychiatrists have more than 40 years experience in rehabilitation and psychiatric treatment. All patients experience an acclaimed life-management program to recover a healthy routine.

OUR SERVICES

Treatment for Drugs & Alcohol Addiction

Life Management Program

Our program is individually tailored to meet the needs of the patient so that he/she may move forward to lead a happy and sober life

Intense counselling and therapy both to the patient and the family on a regular basis

Integration with support group for continued assistance after the completion of the program

Activities such as outdoor sports and trips to Bangkok and Cox's Bazar to understand the importance of sober fun.

Drug and Alcohol Detoxification

Detoxification from drugs and alcohol in a comfortable and medically supervised setting.

Psychiatric and Psychological treatment

Psychiatric and psychological issues are addressed by our team of doctors and psychologists on a case by case basis

Family counselling services to the patient as well so he/she may re-adjust to family life and society easily

Outdoor patients counseling

Counselling services are offered to married couples so that they can resolve their family issues and improve their communication with each other.

Drug Screening Test

24x7 HELPLINE

+88-01711979777

+88-01947400400

HOSPITAL : HOUSE # 13, ROAD # 5, BLOCK # J, BARIDHARA R/A, DHAKA 1212

TEL : +88-02- 222280522,222294403 **email** : info@prottoymedical.com

www.prottoymedical.com

BEACON Point Limited

ISO 9001 2015 CERTIFIED

মাদকের অভিশাপ থেকে
বাঁচতে চান?
শুরু হোক স্বাভাবিক জীবনে
ফেরার স্বপ্নের যাত্রা...

বীকন পয়েন্ট লিমিটেড®

দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

CARE LINES 24/7

01985 550068
01985 550069
01985 550678

বিশেষত্ব

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি
- অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, চিকিৎসক ও নার্স
- যুক্তরাজ্যের বিশেষ প্রশিক্ষিত দক্ষ কাউন্সিলর
- নারীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক চিকিৎসা ও আবাসন
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক কক্ষ, জিম, ইয়োগা এবং প্রার্থনা স্থান
- চিকিৎসা পরবর্তী বাকি জীবন সুস্থ থাকার একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম
- নিরাপত্তার সাথে আউটিং প্রোগ্রাম
- সার্ভিস টিমের মাধ্যমে রোগীদের নিরাপদে চিকিৎসার জন্য আনার ব্যবস্থা

✓ রোগীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ মানবিক আচরণ আমাদের চিকিৎসার মূলমন্ত্র

ঠিকানাঃ
বাড়িঃ ০৪, রোডঃ ২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ই-মেইলঃ info@beaconpointbd.com
ওয়েবসাইটঃ www.beaconpointbd.com
ফেসবুক: www.facebook.com/beaconpointltd

বীকন পয়েন্ট লিমিটেড®
আলোকিত জীবনের জন্য

◆ বীকন গ্রুপের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ◆

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন "শেখ রাসেল দিবস -২০২১" উদ্‌যাপন

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উদ্যোগে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস -২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া কোম্পানীর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট আবদুল আউয়াল হাওলাদার, সাবেক যুগ্ম সচিব ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট মোঃ আনিস উদ্দিন মিঞা, সাবেক প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক (ইনচার্জ) ও কোম্পানীর সিনিয়র কনসালট্যান্ট রায় দেবদাস, ডিএমডি আলমগীর ফিরোজ রানা সহ কোম্পানীর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড